কেমন করে হল

অসীম দাস



প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৮৬
প্রকাশক :
অনুপ সিংহ
সুবর্ণরেখা
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা

Acc No - 15447

গ্রন্থস্বত্ব : অসীম দাস

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী

দাম : ১০.০০

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত

মুদ্রাকর :
এম. এম. দত্ত
মা শীতলা কম্পোজিং ওয়ার্কস
৭০ ডবলু. সী. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

পুত্র অনির্বাণকে

কেমন করে হল

অসীম দাস

সুবর্ণরেখা
কলিকাতা / শান্তিনিকেতন
১৯৮৬

॥ পূর্বকথন ॥

বস্তুজগৎ ও জীবন উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক কারণ এবং মানব সংস্কৃতির প্রধান প্রধান ধারা সমূহের সমাজ বৈজ্ঞানিক উৎসগুলির ব্যাখ্যা একই সঙ্গে একই মলাটের মধ্যে তেমন চোখে পড়ে না। অথচ কিশোর ও তরুণ মনে বিষয়গুলির প্রতি শত সহস্র মূক জিজ্ঞাসা বহুদিন জীবন্ত থাকতে থাকতে উত্তর না পেয়ে অবশেষে একদিন মরে যায়। কিশোর ও তরুণ মনের সেই ক্ষুধিত জিজ্ঞাসার কথা ভেবেই এই বইয়ের পরিকল্পনা। দিকপাল বিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের গ্রন্থ ঘেঁটেই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবু কেউ কোনো তথ্য ও তত্ত্বগত ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বাধিত হ'ব।

বিষয় নির্বাচন ও রচনা প্রকরণের ব্যাপারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নানা পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন শ্রীমতী নীলিমা দাস। আর বইয়ের অঙ্গসৌষ্ঠব, ছাপাখানার দায়িত্ব, এমন কি প্রুফ সংশোধনের মত বিরক্তিকর দায়টুকু গ্রহণ করেছেন অনুজ শ্রীমান অনুপ সিংহ। এঁদের কারো সঙ্গেই ঋণ স্বীকার করবার সম্পর্ক আমার নয়।

প্রখ্যাত শিল্পী খালেদ চৌধুরী মহাশয় প্রচ্ছদ এঁকে দিয়ে বইয়ের গৌরব বাড়িয়েছেন। তাকে সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক অর্থানুকূল্যেই এই বই প্রকাশ সম্ভব হল। সুতরাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তার প্রতিও।

—অসীম দাস

শ্রীপুর, মধ্যমগ্রাম
(২৪ পরগণা।)
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ১৩৯২
২৮শে অক্টোবর, ১৯৮৫

বাবাইয়ের সঙ্গে আলাপ

সাত-আট বছর বয়েস। চোখ ছুটো ওর ভাসা ভাসা। সব সময়েই যেন ঘুম পাচ্ছে বাবাইয়ের। যেন স্বপ্ন দেখছে। বাবাইয়ের ফর্সা রঙ আর এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল।

ইসকুল যেতে যেতে যদি সে দেখে কাক তার বাচ্চাকে ঠোঁটে করে খাইয়ে দিচ্ছে, অমনি ওর কোঁকড়াচুলো মাথায় হাজারো প্রশ্ন খচমচিয়ে ওঠে। সব কাকই তো একরকম দেখতে, তাহলে কাক-মা ওর বাচ্চাকে চিনল কেমন করে! কী করে বুঝল বাচ্চার ক্ষিদে পেয়েছে!—ইত্যাকার নানা প্রশ্ন।

বিকেল বেলায় মাঠে খেলতে খেলতে, আকাশের গায়ে ডুবন্ত সূর্যের নানা রঙের খেলা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। অন্য ছেলে ওকে ছুঁয়ে মোর করে দিয়ে চলে গেল সেদিকে খেয়ালই নেই। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বয়স্ক একজনকে হুম করে জিজ্ঞেস করল—'আকাশের রঙ অমন বদলে বদলে যায় কেমন করে গো?' থতমত খেয়ে বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন—'এটা জানো না? সূর্য ডুবছে যে।' এই উত্তরে 'তুমি কিচ্ছু জানোনা' বলে ছুটে দাছুর কাছে চলে যায় বাবাই।

বাবাই যে কথায় কথায় ছুটে ওর দাছুর কাছে চলে যায় তার একটা রহস্য আছে। সারা দিন এত কথার উত্তর দেবে কে, দাছু ছাড়া? ওর বাবা যেন কোন কলেজের অধ্যাপক, সারাদিন পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আর মা একটা ইসকুলের দিদিমণি, তাছাড়া তাঁর সংসারেরও নানান কাজ। কিন্তু দাছু ছিলেন একটা ইসকুলের মাস্টার মশাই, এখন রিটায়ার করেছেন। তাঁর সময়ও যেমন অনেক, নাতির সঙ্গে বক বক করতেও তিনি তেমনি ওস্তাদ। দাছু তাই বাবাইয়ের আসল বন্ধু। দাছুর কথা ওর কাছে একেবারে

বেদবাক্যি। দাদুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাবাই রাজপুত্তুর-রাজকন্যেদের যেন দেখতে পায়। যখন তিনি তারা, সূর্য, ধূমকেতুর কথা বলেন নাতিও যেন মনে মনে তারা-সূর্য-ধূমকেতু হয়ে যায়।

দাদুর একটা সুবিধে হল উনি সব জানেন। কীট পতঙ্গ আর পশুপাখির ভাষা বোঝেন। গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্য-চাঁদের নাড়িনক্ষত্র জানেন। গাছপালা আর ফুল-লতা-পাতার খবর তাঁর নখদর্পণে। আর মানুষ ? তার তো কথাই নেই। উনি যেন স্বচক্ষে এই মাত্তর দেখলেন বানর থেকে মানুষ কেমন করে হল।

মাছেরা নাকি কানকো দিয়ে নিশ্বাস নেয়। দাদুর কথা ফেলাও যায় না। কিন্তু কথাটা শুনে থেকে হাসি আর বন্ধ হতে চায় না। কান দিয়ে কেউ নিশ্বাস নেয় ? মা আর বাবা বাড়ি ফিরতেই খবরটা জানাল সে। কিন্তু কেউ হাসল না। শুধু বলল—'তাই নাকি ?' এই জন্যে বাবাইয়ের রাগ হয় বড়দের উপর। ওরা সব কথার উত্তরও দিতে পারে না, আবার মজার কথা শুনে হাসতেও জানে না। শুধু বই পড়তে জানে, কাজ করতে জানে, আর চা খেতে জানে। কিন্তু দাদুর ব্যাপারটাই অন্য রকম। এইতো সেদিন চিড়িয়াখানায় গিয়ে বাবাই বাঘ দেখল। সে শুনেছে মানুষ পেলেই আর রক্ষে নেই, বাঘে অমনি চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। তাহলে বাঘকে এখনো মানুষ খেতে দেয় নি কেন ? 'বাঘের ক্ষিদে পায় না ?'- বাবাইয়ের জিজ্ঞাসা। দাদু অমনি বাঘের চোখমুখ আর গোঁফ দেখেই বুঝে ফেললেন সব, বললেন—'আজ একাদশী তো, আজ বাঘের উপোস। তাই বাঘ খেতে চায় নি, আর কেউ খেতে দেয়ও নি।' শুনে বাবাই নিশ্চিন্ত হয়, কারণ সে দেখেছে তার বিধবা পিসিমা একাদশীর দিন উপোস করেন। বাবাই জানে—এ প্রশ্ন যদি সে অন্য কোনো বড় মানুষকে করত তাহলে সে উত্তর তো দিতেই পারত না, আবার বিরক্ত হয়ে বলত—'এখন চুপ কর তো, তুমি বড্ড বকো।' বাবাই তাই দাদুর বুদ্ধির তারিফ না করে পারে না। সেদিন দাদুর চেয়ে নিউটনের বুদ্ধি বেশি শুনে সে একেবারে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে

তুলেছিল প্রায়। পরে দাদু যখন বুঝিয়ে বললেন যে, নিউটনের আসলে বুদ্ধি কম, কারণ মাথায় একটা আপেল পড়ল অথচ সেটা খাবার বুদ্ধি হয় নি তাঁর, তার বদলে কী সব যেন চিন্তা করতে লাগলেন। এই যুক্তি শুনে কোনো মতে শান্ত হয় নাতি।

এই হল বাবাই। বাবাইয়ের সঙ্গে ওর দাদুর কি কি কথা হয়েছে বা হয় তার সব তো আমরা জানি না। তবে ওদের যে সব কথা হঠাৎ হঠাৎ আমরা শুনতে পেয়েছি বা মাঝে মাঝেই পাই, সে গুলোই এবার বলব।

ব্রহ্মাণ্ডের মামলেট

ইসকুলে মাস্টারমশাই বলেছেন সূর্য-চাঁদ-পৃথিবী-তারা এই সব নিয়ে নাকি ব্রহ্মাণ্ড। আচ্ছা অণ্ড মানে তো ডিম, কিন্তু ব্রহ্ম মানে কী? ব্রহ্ম মানে কি মুরগি?

প্রশ্ন শুনে দাদু একবার ফ্যাক ফ্যাক করে হাসল, আর 'ব্রহ্ম' কথাটায় মাথায় বেদ উপনিষদের কত কথাই ঘুরে গেল। তবু হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তে দাদু বলল—কী সব্বনাশ! তারা-পৃথিবী এই সব দিয়ে যদি ব্রহ্মাণ্ড হয় তাহলে অত বড় ডিম সিদ্ধ হবে কিসে? তাছাড়া অত বড় ডিমের মামলেট করলেও তো বিরাট ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে দেখছি। তাই কখনো হয় নাকি! দাদু অবাক হয়।

দাদুকে এতদিন পরে একটু বেকায়দায় ফেলা গেছে দেখে বাবাই মনে মনে একটু খুশি হয়। তাই জোর দিয়ে বলে—তাই-ই যদি না হবে তাহলে তুমিই বল না ঐ সূর্য, চাঁদ, তারা সব কেমন করে হল?

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাইরেটা অন্ধকার। দাদু বলল—চল দাদুভাই ছাদে গিয়ে বসি। এখানে বড় গরম।

ছাদে গিয়ে মাদুর পেতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল দু জন—দাদু আর নাতি। ফুর ফুর করছে হাওয়া আর আকাশ ভরা অসংখ্য তারা। হঠাৎ দাদু আকাশের এক জায়গায় আঙুল দেখিয়ে বলে—দেখ তো দাদুভাই ঐ তারাগুলোর মাঝখানে ঝাপসা মতন খানিকটা কী যেন লেগে রয়েছে না ?···আমার চোখটা কি একেবারে গেল !

অনেকক্ষণ তাকিয়ে বাবাই বুঝলো ছায়াপথ তো ওটা নয়। ছায়াপথ সে চেনে। তারপর বলল—না দাদু, তুমি ঠিকই বলেছ। ওখানে কেমন করে যেন একটু আলো লেগে গেছে।···ঐ দিকটায় তাকিয়ে দেখ, ওখানেও খানিকটা আলো লাগানো আকাশ দেখা যাচ্ছে, ছোপ ছোপ সাদা সাদা মেঘের মতন।

—ও গুলোকে বলে নীহারিকা।

—সে আবার কি দাদু ?

—ইংরেজিতে বলে 'নেবুলা।' নীহারিকা নানান ধরনের হয়। কোনোটা ছায়াপথের মতই অসংখ্য নক্ষত্র দিয়েই তৈরি, কিন্তু অনেক অনেক দূরে থাকে বলে তারাগুলোকে আলাদা করে চেনা যায় না, মনে হয় যেন একটা আলোর ছোপ। আর অন্য এক ধরনের নীহারিকা আছে যেখানে কোনো তারা নেই। ওখানে আছে আসলে ছোট্ট ছোট্ট ধূলোর কণা আর নানান রকমের গ্যাস···

দাদুকে কথা শেষ না করতে দিয়েই অধৈর্য বাবাই মাঝ পথে বলে—সে আবার কেমন কথা ?

—দেখিস নি, রাস্তা দিয়ে হুস করে একটা গাড়ি চলে গেলে, কিংবা হঠাৎ ঝড় শুরু হলে কেমন ধূলো উড়তে থাকে, সব কেমন ঝাপসা হয়ে যায় ?···আচ্ছা শীতকালে সকালে কুয়াশা দেখেছিস তো ? দূরের জিনিস কিছুই দেখা যায় না কুয়াশায়, দেখিস নি ? আসলে খু-উ-ব ছোট্ট ছোট্ট জলের কণা ভাসতে থাকে বাতাসে। ঠিক সেই রকমই হচ্ছে নীহারিকাদের কোনো কোনোটা। উড়ন্ত ধূলো-বালি-গ্যাসের উপর আশপাশের গ্রহনক্ষত্রের আলো পড়ে ঐ রকম আলোর মেঘের মতন দেখায়।

—তা অত উঁচুতে ধূলো, গ্যাস এসব গেল কেমন করে? এখান থেকে কি ধূলো অত দূরে উড়ে যেতে পারে?

ফ্যাক ফ্যাক করে খানিকটা খুশির হাসি হেসে দাদু বলে—এটা বড় বুদ্ধির প্রশ্ন করেছিস দাদু ভাই।···আসলে ঐ ধূলো কিন্তু পৃথিবীর ধূলো নয়।—দাদু বলে—ঐ ধূলো এসেছে নীহারিকার আশপাশের নক্ষত্র থেকে। তার পর ওখানে এসে ভাসছে।

বাবাই এবার বুঝতে পেরেছে যে, দাদু সেই ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরটা জানে না বলেই ঐ সব নীহারিকা-টিকা বলে ওকে ভোলাচ্ছে। কিন্তু ছেলেমানুষ হলে কি হবে, বাবাইয়ের বুদ্ধি আছে ঢের। তাই সে দাদুকে পেড়ে ফেলে—নীহারিকা-টিকার কথা তো অনেক হল, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডের কি হল দাদু?

ওঃ হো তাইতো!—দাদু যেন সম্বিৎ পান—আচ্ছা দাদুভাই, ব্রহ্মাণ্ডের মামলেটটা তাহলে কত বড় হবে বল তো? গড়ের মাঠও ছাড়িয়ে যাবে কি বল?···কিন্তু সে মামলেট খেতে তো মনুমেণ্টের মতন চামচ লাগবে, তাই-ই বা পাওয়া যাবে কোথায়?

অবান্তর কথায় নাতি রেগে গিয়ে প্রায় উঠে যায় দেখে দাদু তাড়াতাড়ি শুরু করে—সে অনেক অনেক অনেক বছর আগেকার কথা। তখন সূর্য, পৃথিবী, চাঁদ—এ সব কিচ্ছুটি ছিল না।

চোখ ছানাবড়া করে বসে পড়েই বাবাই জিজ্ঞাসা করে—সে কত বছর আগে দাদু?

—তা ধর,—মনে মনে কী যেন ভেবে নিয়ে দাদু বলে—অন্তত-পক্ষে পাঁচশো কোটি বছর তো হবেই।

—পাঁচ-শো কো-টি বছর!!

—হ্যাঁরে দাদুভাই। তখন ঐ নীহারিকার মত ছিল শুধু ধুলো আর বালি আর অন্য নানা রকম বস্তুর দানা।···শত শত হাজার হাজার বছর ধরে সে গুলো ভাসতে ভাসতে একটা কণা আর একটা কণাকে টেনে নিতে লাগল, সেটা আবার অন্য কণাকে টেনে নিল। এমনি ভাবে বস্তুকণাগুলো একটু একটু করে বড় হতে লাগল।

একটু একটু জলকণা মিশে মিশে কচুপাতার উপর ইয়া বড় একটা টলটলে শিশিরের বিন্দু যেমন করে হয়, ঠিক তেমনি।

—একটা কণা আর একটা কণাকে কেমন করে টেনে নিল? ধূলোর গায়ে জোর আছে নাকি?

—আছে বৈকি দাদুভাই। সেই বোকা হাঁদা নিউটন বিজ্ঞানীটাই সে কথা আবিষ্কার করে গেছে। মাথায় আপেল পড়তেই, এমন হাঁদারাম যে, সেটা কুড়িয়ে খাবার কথা ভুলে জিনিস কেন মাটিতে পড়ে, কেন আকাশে উড়ে যায় না—এই সব ভাবতে লাগল। আর আবিষ্কার করে ফেলল যে, সব সময় সব জিনিস সব জিনিসকে নিজের দিকে টানে। বড় জিনিসের শক্তি বেশি তাই সে ছোট জিনিসকে নিজের দিকে টানে। বড় জিনিস টেনে নেয় আরো ছোট জিনিসকে।

বিস্মিত বাবাই এইটুকু শুনে মুখ ফসকে বলেই ফেলল—তাহলে কিন্তু নিউটনের বুদ্ধি তোমার থেকে বেশি। বাবা সেদিন ঠিকই বলেছিল। তোমার মাথায় সেদিন লেপ তোষকের বস্তাটা ছিঁড়ে পড়ল, তুমি কিছু আবিষ্কার করতে পারলে? তোমার শুধু খাওয়ার কথা।

নিউটনের থেকে বুদ্ধি কম বলায় দাদুর অভিমান হয়েছে। অনেক সাধ্য সাধনা করে আর পাকাচুলো মাথায় হাত বুলিয়ে দাদুকে ঠাণ্ডা করে বাবাই। দাদু তখন আবার শুরু করে—

কণাগুলো তো এই রকম ভাবে বড় হতে লাগল, আর ওজনেও বাড়তে লাগল। দু সের, পাঁচ সের, পাঁচ দশ মন থেকে একেবারে হাজার হাজার মন ওজন হয়ে উঠল এক একটার। তারপর কোনোটা দু দশ গজ, কোনোটা দু দশ মাইল পর্যন্ত বেড়ে উঠল। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এদের আবার অপরকে টানার শক্তিও গেল বেড়ে। তখন ধাক্কাধাক্কি লেগে কোনো কোনাটা আবার গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে গেল, আর কোনোটা আরো অনেক অনেক অনেক বড় হয়ে উঠল। এমনি করে কোটি কোটি বছর ধরে ভাঙচুর হতে

হতে এখন আমরা যে সূর্য দেখি আর নয়টা গ্রহের কথা শুনি, কিম্বা চাঁদের মতন যে সব উপগ্রহের কথা জানি তাদের সৃষ্টি হয়েছে। স্রেফ ধূলো-বালি-গ্যাস আর বস্তু-কণা দিয়ে ওরা তৈরি।

শুধুমাত্র তুচ্ছ ধূলোবালি আর গ্যাস দিয়ে সূর্য, পৃথিবী সব সৃষ্টি হয়েছে শুনে বোয়াল মাছের মতন হাঁ করে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল বাবাই। দাদু সেদিকে না তাকিয়ে এখনো বলে চলেছে—

সূর্য সব থেকে বড় তাই সে তার নয়টা গ্রহকে টেনে রেখেছে। তারা কেউ দূরে যেতে পারছে না, সূর্যের টানে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। গ্রহগুলো উপগ্রহের চেয়ে বড় তাই তারা গ্রহের টানে গ্রহের চার দিকে ঘুরছে। যেমন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, আবার চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।

বাবাই এখনো আকাশের দিকেই তাকিয়ে আছে। শুনছে কি শুনছে না বোঝা যাচ্ছে না। ও দিকে দাদু আপন মনে বলেই চলেছে —চাঁদের টানে পৃথিবীর জলে যেমন জোয়ারভাঁটা হয়, সূর্যের প্রবল টানে তেমনি ঐ বিশাল ধূলোর রাজ্যে ধূলোর জোয়ারভাঁটা হয়। তাই সূর্যের কাছাকাছি যে সব গ্রহ সে গুলো বেশি ধূলোবালি নিজের কাছের টেনে নিতে পারে না, সূর্যই সব টেনে নেয়। তাই সূর্যের কাছের গ্রহগুলো ছোট। কিন্তু সূর্যের থেকে যত দূরে যাওয়া যাবে, সূর্যের টানও সেখানে কম পৌছবে। সূর্য থেকে দূরের গ্রহগুলো তাই বেশি বস্তুকণা নিজের মধ্যে টেনে নিতে পারে। সূর্য থেকে দূরের গ্রহগুলো যেমন ইউরেনাস, নেপ্‌চুন, প্লুটো এরা সব বিরাট বিরাট আকারের। সেই তুলনায় সূর্যের কাছের গ্রহ যেমন বুধ পৃথিবী, মঙ্গল এরা সব অনেক ছোট ছোট।

বিস্ময়ের ভাবটা একটু কাটিয়ে বাবাই বলল—সূর্য, পৃথিবী, চাঁদ সব যদি ধূলো আর বস্তুকণা দিয়েই তৈরি হয়ে থাকে, তবে যে লোকে বলে সূর্য থেকে খানিকটা ছিটকে এসে পৃথিবী, আর পৃথিবী থেকে খানিকটা ছিটকে গিয়ে চাঁদ সৃষ্টি হয়েছে?

—হ্যাঁ দাদুভাই, কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা তেমনই মনে করতেন। এখন সে ধারণা পাল্টে গেছে। যেমন ধর, আগে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন পৃথিবীর চার দিকে সূর্য ঘোরে, কিন্তু এখন সবাই জানে পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে।···এই দেখ না দাদু-ভাই, এখন আবার বিজ্ঞানীরা নতুন করে ভেবেচিন্তে বলছেন যে, বিরাট বিশাল এক গ্যাসের স্তূপ থেকেই নাকি সূর্যের উৎপত্তি। কী একটা কারণে সেটা ক্রমে ক্রমে খুব-খুব জোরে ঘুরতে থাকল। তাতে তার যেমন তাপ বাড়তে লাগল, তেমনি চাপও বাড়তে লাগল। দুই দিকে চাপ খেতে খেতে এমন হল যে, মাঝখানটা ভীষণ ফুলে উঠল। ঠিক বেলুনের দুই দিকে চাপ দিলে মাঝখানটা যেমন হয় তেমনি আর কি। তারপর চার দিকের গোল ফোলা অংশটা আলাদা হয়ে গেল, আর মাঝখানে রইল সূর্য। এর পর হাজার হাজার বছর কেটে গেলে ঐ গোল চুড়ি বা বালার মত অংশটা ধীরে ধীরে অনেক অনেক দূরে, হাজার হাজার কোটি কোটি মাইল দূরে চলে যেতে লাগল। শেষে ঐ গোল বালার মতন অংশটাই ভেঙে চুরে বুধ, মঙ্গল, পৃথিবী থেকে শুরু করে একেবারে সেই ইউরেনাস, নেপ্‌চুন, প্লুটো পর্যন্ত নানান গ্রহ আর চাঁদের মতন নানান উপগ্রহ সৃষ্টি হল। একদিন নিশ্চয়ই এ সব কথাও লেখা হবে ইসকুলের পড়ার বইতে। এখন অবশ্য ইসকুলের বইতে সূর্য থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হবার পুরনো ধারণার কথাই লেখা হয়। ঐ লেখাও আস্তে আস্তে বদলে যাবে।

বাবাই তেমনি রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সপ্তর্ষি, কালপুরুষ কিছুই তার চোখে পড়ছে না। সে যেন এক অসীম অনন্ত ধূলোর রাজ্যে ছোট্ট একটা বস্তুকণা হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে পড়ছে ইসকুলের ইংরেজি স্যারের পড়ানো ছোট্ট একটা কবিতার কথা। কবিতাটা এতক্ষণে সে যেন সত্যিই বুঝেছে মনে হচ্ছে।

কতক্ষণ এইভাবে কেটেছে জানি না। দাদু আর নাতি দুজনেই

নীরব। একটু পরে দাদু বলে—কি দাদুভাই, ব্রহ্মাণ্ডের মামলেট খাবি নাকি আর একটা?

ভাবাবিষ্ট বাবাইয়ের কানে দাদুর ঠাট্টাটুকু পৌঁছয় না। অতি ধীরে, প্রায় ফিসফিস করে বাবাই ইসকুলে পড়া সেই ইংরেজি কবিতাটার কয়েকটা লাইন উচ্চারণ করতে থাকে—

লিটল্ ড্রপস্ অব্ ওয়াটার
লিট্ল্ গ্রেন্স্ অব্ স্যাণ্ড,
মেক্ দ্য মাইটি ওসান
এ্যাণ্ড দ্য প্লেজ্যাণ্ট ল্যাণ্ড।

দাদু নাতির মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে শুধু, কোনো কথা বলে ওর আবেগটুকু ভাঙতে চাইছে না। নীচ থেকে মার ডাক শোনা গেল—বাবাই, দাদুকে নিয়ে খেতে এস। রাতের তারা ভরা আকাশের নীচে দাদু-নাতির সভা ভেঙে গেল।

ইসকুলের কানকো

ইসকুলে টিফিন। গাছতলায় বসে বুম্বা বাবাইকে প্রশ্ন করেছিল—মুরগি আগে না ডিম আগে? বীজ আগে না গাছ আগে? উত্তর দিতে না পেরে বাবাই বলেছিল—দাদু নিশ্চয়ই উত্তরটা দিতে পারবে।

—রেখে দে তোর দাদু, দুনিয়ার কেউ এর উত্তর জানে না। বুম্বা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে।

দাদুর অপমান বাবাই হজম করার ছেলে না। হঠাৎ উঠেই ধা করে একটা ঘুঁষি মারে বুম্বাকে। তারপর বই খাতা ইসকুলে ফেলেই সোজা দৌড় বাড়ির দিকে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একটু দিবানিদ্রা দিচ্ছিল দাদু। নাতির ধাক্কায় ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। নাতির প্রশ্নটা শুনল।

দেখল বাবাই উত্তেজনায় কাঁপছে। তাড়াতাড়ি খুলে রাখা বাঁধানো দাঁত জোড়া পরেই আগে একবার হাসল—ক্যাক ক্যাক ক্যাক। তারপর বলল—ছোঃ, এটা আবার একটা প্রশ্ন নাকি? এসব প্রশ্নের উত্তরতো আমি বাঁ-হাতে দিতে পারি।

বাঁ-হাতে আবার উত্তর দেয় কেমন করে!—এসব বিচারে না গিয়েই এতক্ষণের দমবন্ধ বাবাই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। সত্যি, কী সর্বনাশই না হয়েছিল! দাদু যদি উত্তর দিতে না পারত! তাহলে মুখ দেখানো যেত বুম্বার কাছে?

বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। দূরে কোথায় ঘু ঘু করে ঘুঘু ডাকছে। সেই নিরালা দুপুরে নাতির মুখটা নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিল দাদু। তারপর দাদু আর নাতি ডুব দিল তাদের স্বপ্নের সমুদ্দুরে। দাদু বলল—মুরগি আর ডিম, কিম্বা বীজ আর গাছ কেউই কারো আগে নয়। ওরা সবাই হল অনেক অনেক পরে!

—সেকি! তাহলে এত সব পশু পাখি, গাছ-পালা এরা সব এল কোথা থেকে? বাবাইয়ের বিস্ময়।

—দেখ দাদুভাই, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিন রকম জিনিস আছে। জীব, জড় আর উদ্ভিদ। পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, মানুষ এরা সব জীব। ইট, কাঠ, ধাতু, পাথর এরা হল জড়। আর গাছ, লতা, ঘাস এই সব হল উদ্ভিদ। এদের মধ্যে জীব আর উদ্ভিদের প্রাণ আছে, ওরা জীবন্ত। কিন্তু জড় পদার্থের প্রাণ নেই। আমি তো আগেই একদিন বলেছিলাম। পৃথিবীর বয়েস পাঁচশো কোটি বছরেরও বেশি। আর এই পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি হয় প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে। তার আগে কয়েক কোটি বছর ধরে তো পৃথিবীতে কোনো প্রাণই ছিলনা। সুতরাং কোথায় বা তখন মুরগি, কেই-বা খাবে তার ডিম? কোথায়ই বা তখন গাছ, আর কোথায় বা তার বীজ? পৃথিবীটা তখন প্রাণহীন শ্মশান ছাড়া আর কিছুই না।

—তাহলে সেই শ্মশানে প্রাণ এল কেমন করে? বাবাইয়ের বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

—ঐ জড় পদার্থ থেকেই ধীরে ধীরে প্রাণ সৃষ্টি হল। দাদু উত্তর দেয়।

বাবাই এবার লাফিয়ে উঠল আশ্চর্য হয়ে—তার মানে ইট-কাঠ-পাথর-ধূলো-মাটি থেকে প্রাণ তৈরি হল?

—হ্যাঁরে দাদুভাই, পাল মশাই যেমন মাটির সাথে খড়, তার সাথে বাঁশের বাখারি, তার উপর রঙ, রাংতা কত কিছু সব জুড়ে জুড়ে সুন্দর একটা দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে, ঠিক তেমনি এই জড় জগতের শত সহস্র জিনিস নানা ভাবে একে অপরের সঙ্গে মিশতে মিশতে জুড়তে জুড়তে একদিন প্রাণ সৃষ্টি হল পৃথিবীতে। অবশ্য ঠিক যেমন করে হল তার সবটুকু এখনো মানুষ জানতে পারে নি, তবে অনেকটাই জেনে ফেলেছে।

—তার মানে একটা পাথর থেকে একদিন একটা মুরগি বেরিয়ে এসে ডিম পাড়তে শুরু করল!!

নাতির কথা শুনে দাদু একবার ফ্যাক-ফ্যাক করে স্বভাব-সুলভ হাসি হাসল। তারপর বলল—ব্যাপারটা প্রায় তাই-ই, কিন্তু অত জল-ভাতের মত না।...দেখ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমরা কত রকম জিনিসই না দেখি। কিন্তু ওদের সকলেই তৈরি হয়েছে মোট বিরানব্বইটা জিনিস দিয়ে। ওরা হল যেমন—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, হিলিয়াম, লোহা, ইউরেনিয়াম এই সব আর কি। এদের বলে মৌলিক পদার্থ। আবার ঐ মৌলিক পদার্থগুলো মিশে মিশে অন্য সব জিনিস সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ধর, অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন মিলে তৈরি হল জল। এই ধরনের জিনিসগুলোকে বলে যৌগিক পদার্থ।

—কিন্তু ওদের থেকেই যে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে বুঝলে কি করে?

—প্রাণীর দেহ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যে সব জিনিস দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি, সেই সব জিনিস দিয়েই প্রাণীর দেহ তৈরি হয়েছে। প্রাণীর দেহে তার থেকে একটাও বেশি জিনিস নেই। আর পৃথিবী সৃষ্টির কোটি কোটি বছর পরে যখন প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে,

তখন বুঝতে হবে নিশ্চয়ই ঐ শ্মশান-পৃথিবীর বস্তুকণা থেকেই উপাদান সংগ্রহ করে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে।

—তার মানে এই যে টেবিলটা চার পায়ে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, একদিন এটা হয়তো গরু হয়ে হাম্বা হাম্বা করে ডাকতে ডাকতে হাঁটতে শুরু করবে? বাবা তখন কিসের উপর কাগজ রেখে লিখবে? বাবাইয়ের দুশ্চিন্তা।

—তোর সে চিন্তা নেই দাদুভাই। জড়বস্তু হঠাৎ করে গরু-ছাগল-উট-মানুষ হয়ে যায় না। সে সব হতে কোটি কোটি বছর লাগে। পৃথিবীর প্রথম যুগের প্রচণ্ড উত্তাপে, দুর্দান্ত চাপে, ভূমিকম্পে, অগ্ন্যুৎপাতে—দাদু বলে চলেছে—বস্তুজগতের নানা রকম পদার্থ এটার সঙ্গে ওটা, ওটার সঙ্গে সেটা মিশতে মিশতে ভাঙতে ভাঙতে পরিবর্তন হতে হতে একদিন কেমন করে যেন প্রোটিন সৃষ্টি হল।

—প্রোটিন আবার কি?

—প্রোটিন এমন একটি জিনিস যেটা ছাড়া কোন জীবদেহ তৈরিই হতে পারে না।···তারপর সেই প্রোটিন থেকে সৃষ্টি হল ভাইরাস।

—ভাইরাস কাকে বলে দাদু?

—ভাইরাস হল এমন ধরনের জিনিস, যা জীবও বটে আবার জড়ও বটে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও এদের দেখা যায় না। আজকাল অবশ্য অতি শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র বেরিয়েছে, তাই দিয়ে এদের দেখা যায়। ভাইরাসরা যখন কোনো জীবের দেহে ঢুকে পড়ে তখন এরা বেঁচে ওঠে। আর যখন কোনো জীবদেহের মধ্যে থাকে না তখন এরা জড়। তার মানে ভাইরাস হল জীব আর জড়ের মাঝখানের অবস্থা। এই ভাইরাস থেকেই বোঝা যায় যে, জড় থেকেই জীবের উৎপত্তি। দাদু বলল—ভাইরাসের জন্যে যে সব রোগ হয় সেই সব রোগে একই ওষুধ বেশি দিন খেলে আর কোনো কাজ হয় না। কারণ ভাইরাসগুলো ঐ ওষুধের ক্রিয়াকে মেনে নিয়ে কেমন করে বাঁচতে হয় তা শিখে যায়। পরিবেশের সঙ্গে

খাপ খাইয়ে নেবার এই শক্তি, কিংবা বংশ বৃদ্ধি করবার শক্তি, এসব হল জীবের লক্ষণ। আবার ভাইরাস ভায়ারা যখন প্রাণীদেহের বাইরে থাকে তখন তারা ইট কাঠ পাথরের মতই জড় অবস্থায় থাকে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ।

—জানো দাদু, বুম্বাটা না একটা নাদুস নুদুস ভাইরাস, খালি চোখেই দেখা যায়। বুম্বার উপর এখনো রাগ কমে নি বাবাইয়ের।

দাদু একবার ভাল করে কেসে নিয়ে বলল—বুম্বা যদি ভাইরাস হয়, তাহলে তুমি একটা ব্যাক্টিরিয়া নিশ্চয়ই।

বাবাই ভেবেছিল ব্যাক্টিরিয়া বোধ হয় বাঘ ভাল্লুকের মতন কোনো ভয়ঙ্কর জীব। তাই আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল—ব্যাক্টিরিয়া কি দাদু? সে কি মানুষ খায়? আমি তাহলে বুম্বাকে···

বাবাই বুম্বাকে খাওয়ার কথাটা শেষ করতে পারলনা। তার আগেই দাদু বলল—ব্যাক্টিরিয়া অত বড় জন্তু না দাদু ভাই। ব্যাক্টিরিয়া এসেছে ভাইরাসের পরে। সেই ভাইরাস থেকে একটু-খানি মাত্র উন্নত। ব্যাক্টিরিয়া দেখার জন্যে অনুবীক্ষণ দরকার হয়, তবে ভাইরাসকে দেখার মতন অত শক্তিশালী যন্ত্র না হলেও চলে।

এই উত্তরে বাবাই একটু দমে গেল। দাদু বলল—ব্যাক্টিরিয়ার পরে সৃষ্টি হল এককোষী প্রাণী।

—সে আবার কি? বিস্মিত বাবাইয়ের জিজ্ঞাসা।

—আমরা যে সব গাছপালা জীবজন্তু পোকামাকড় দেখি সেগুলো সব লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কোষ দিয়ে তৈরি। আর কোষ হল অতি ছোট্ট ছোট্ট জীবন-কণা। একটা বাড়ি যেমন অনেক ইট গেঁথে তৈরি হয়, একটা মালা যেমন অনেক ফুল গেঁথে তৈরি হয়, ঠিক তেমনি প্রাণীর দেহ অনেক কোষ দিয়ে তৈরি হয়। জীব সৃষ্টির একদম প্রথম যুগে, মানে আজ থেকে কয়েক কোটি বছর আগে প্রথম যে জীব সৃষ্টি হয়েছিল তাদের দেহে ছিল একটি মাত্র কোষ। সেই জন্যে ওদের বলে এককোষী প্রাণী। যেমন প্রোটোজোয়া।

—তুমি তাহলে একটা বুড়ো প্রোটোজোয়া। বাবাই এতক্ষণে তাকে ব্যাক্টিরিয়া বলার প্রতিশোধ নিল।

একটু হেসে দাদু বলে—ঐ এককোষী প্রাণীগুলো সমুদ্রের জলে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নানা রকম পরিবেশে বাস করতে করতে আর নানান পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে বদলে যেতে লাগল। বদলাতে বদলাতে বিভিন্ন পরিবেশে ঐ এককোষী প্রাণী থেকে বিভিন্ন রকম জীবজন্তু আর গাছপালা সৃষ্টি হতে লাগল।

—ওরা সব জলে থাকতে গেল কেন, ডাঙায় থাকলেই তো পারত। হাঁটতে শেখা কি সাঁতার শেখার চেয়ে কঠিন? ওরা যদি ডুবে যেত?

—বড় কঠিন প্রশ্নটা করেছ কিন্তু দাদুভাই। এর উত্তর দেওয়া অত সহজ নয়। দাদু গম্ভীর হয়ে বলল।

কঠিন প্রশ্ন করতে পেরেছে দেখে বাবাইয়ের বেশ গর্ব হল। দাদু বলল—জানিস দাদু, ঐ যে সূর্যটা জ্বলছে ওর সব আলোটা যদি পৃথিবীতে এসে পড়ত তাহলে আমরা বাঁচতে পারতাম না। সূর্য থেকে এমন সব আলোর রশ্মি আসে যেগুলো কোনো জীবের গায়ে পড়লে আর রক্ষে নেই। সূর্যের তেমন এক আলোর রশ্মির নাম অতি বেগনী রশ্মি।

—তাহলে এখনো আমরা বেঁচে আছি কেমন করে?

—এই পৃথিবীতে যে হাওয়ার স্তর আছে সেই হাওয়ার মধ্যে আছে অক্সিজেন, ওজন এইসব গ্যাস। এই হাওয়ার স্তরই শুষে নেয় সূর্যের ঐ সব ক্ষতিকারক রশ্মি। তাই আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু ব্যাক্টিরিয়া বা প্রোটোজোয়ার যুগে তো এই বাতাসের স্তর এমন ভাবে ছিল না। সেই জন্যে ঐ দুর্দান্ত সূর্যরশ্মি সব সময় ধেয়ে আসত পৃথিবীর দিকে। তখন ডাঙায় বেঁচে থাকার সম্ভাবনা তো ছিলই না, একমাত্র জলের মধ্যে নিজেদের লুকিয়ে রেখে ঐ এক-কোষী প্রাণীরা কোনো মতে বেঁচে ছিল। তারপর বহু যুগ পরে

যখন অতি বেগনী রশ্মি শোষণকারী বায়ুর স্তর সৃষ্টি হল তখন আস্তে আস্তে ডাঙাতেও জীবজন্তু সৃষ্টি হতে লাগল।

—তখন সবাই ডাঙায় উঠে এল? বাবাইয়ের জিজ্ঞাসা।

—না রে, সবাই এল না। যে জীব যে পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারল সে সেখানেই থেকে গেল। মাছ কানকো দিয়ে নিশ্বাস নেয় শুনে তুই সেদিন হেসেছিলি। কিন্তু মাছ কানকো দিয়ে জল থেকে শ্বাস নিতে পারে বলেই জলে থাকতে লাগল। যারা তা পারল না তারা ডাঙায় উঠে নাক দিয়ে বাতাস থেকে নিশ্বাস নিল আর ডাঙাতেই বাস করতে লাগল। যারা ভালো করে হাঁটতে বা দৌড়তে পারল না তারা চেষ্টা করতে লাগল কেমন করে ওড়া যায়। তাদের পাখনা গজাল। পাখি হয়ে তারা গাছে গাছে উড়ে উড়ে বাঁচতে শিখল। এমনি করে কেউ কেউ আবার মাটির নীচে বাস করা অভ্যেস করল যেমন—কেঁচো, ইঁদুর, খরগোস এই সব।···এ সব কি আর এক দুই দিনে হয়েছে? কত লক্ষ কত কোটি বছর কেটে গেছে তার কি ঠিক আছে? এই প্রাণীরও আবার পরিবর্তন হচ্ছে অতি ধীরে ধীরে। কয়েক লক্ষ বছর পরে হয়তো এখনকার প্রাণীগুলো অন্য প্রাণী হয়ে যাবে।

বাবাইয়ের চোখের সামনে এখন সূর্য-নক্ষত্র-জীবজন্তু-কীট-পতঙ্গ সব তালগোল পাকিয়ে ঘুরছে। এক বিচিত্র বিস্ময়ে সে যেন কোন সুদূর অতীতের আদিম আকাশে প্রোটোজোয়া-ব্যাক্টিরিয়া-ভাইরাস হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দাদুর ডাকে ওর যেন ঘুম ভাঙল—তাহলে বুঝতেই পারছ দাদুভাই, বীজ আগে না গাছ আগে কিংবা ডিম আগে না মুরগি আগে—এই প্রশ্নের উত্তর কত সহজ!

এমন সময় হঠাৎ মার প্রচণ্ড বকুনিতে পুরো আবহাওয়াটা পাল্টে গেল। বাবাইয়ের মা যখন ইসকুল থেকে ফিরছিলেন তখন সফল এসে ইসকুলে ফেলে আসা বাবাইয়ের বইগুলো তাঁর হাতে দেয়, আর ওর ইসকুল থেকে পালানোর কথাও বলে দেয়। তাই বাবাইয়ের মার এত রাগ। বাইরে থেকে মার চিৎকার শুনেই

বাবাই দাতুর পাশে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ল। মা রাগের মাথায় ছুম ছুম করে চলে যেতেই বাবাই চোখ দুটো পিটপিটিয়ে দাতুকে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা দাতু, ইসকুলটা ডাঙায় উঠে এল কেমন করে বলতো? ইসকুল কানকো দিয়ে নিশ্বাস নিতে পারে না?

দাতুর ছেলেবেলা

বিকেল বেলাতেই প্রচণ্ড বৃষ্টি। বুম্বা আর সফল বাবাইদের বাড়িতে এসে আটকে গেছে। খেলতে বেরনো হয়নি। সন্ধ্যা হয়ে এল। দাতু এখনো বেড়িয়ে ফেরে নি। হয়তো বৃষ্টিতে কোথাও আটকে গেছে। সুতরাং বর্ষার সন্ধ্যায় জমিয়ে বসে দাতুর কাছে যে গল্প শোনা যাবে তারও সম্ভাবনা কম।

এমন সময় ছাতা মাথায় দিয়ে অথচ ভিজতে ভিজতে দাতুর প্রবেশ। হাতে আবার গরম গরম বেগুনি পিঁয়াজি আর আলুর চপ। লাফিয়ে উঠল সবাই। দাতু গল্প বল—দাতু গল্প বল—সবার চিৎকার।

জামাকাপড় ছেড়ে, গা-হাত-পা-মুছে বেশ আরাম করে বসল দাতু। ইতিমধ্যে বাবাইয়ের মা তেলেভাজা গুলো প্লেটে করে সবার সামনে পরিবেশন করে গেছেন। কেউ বলল ভূতের গল্প, কেউ বলল ডাকাতের গল্প শুনবো। শেষ পর্যন্ত সবাই একমত হয়ে ওরা বলল দাতুর ছোটবেলার গল্প শুনবে।

—ছোটবেলার কথা এখন কি আর সব মনে আছে বাছারা? মুখে একটা আস্ত বেগুনি চালান করে দিয়ে বলল দাতু।

—এর মধ্যে সব কেমন করে ভুলে গেলে? তোমার বয়েস কত দাতু? জ্যাঠামশাইয়ের মত কথাটা বলল বুম্বা।

একটু হেসে, তারপর কী যেন একটু চিন্তা করে দাতু বলল—বয়েস আমার বেশি না, মাত্তর দেড়-তুই কোটি বছর হবে।

তেলেভাজা হাতে নিয়ে সবাই মুখে তুলতে যাচ্ছিল। দাছর বয়েসের কথা শুনে বিস্ময়ে সেগুলো হাত থেকে পড়ে গেল। দাছ সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কোঁৎ করে একটা বেগুনি গিলে নিল, তারপর বলল—অবাক হস না কিন্তু। আমার বয়েস সত্যিই তাই। তখন আমরা কথাও বলতে পারতাম না, খাড়া হয়ে হাঁটতেও পারতাম না। এখনকার বিজ্ঞানীরা আমার সেই সব থেকে ছোটবেলার, অর্থাৎ প্রায় ছুই কোটি বছর আগেকার অবস্থাটাকে বলেন—রামাপিথেকাস্। তখন আমার চেহারাটা ছিল গরিলার মতন। রান্নাবান্না তো তখন শিখি নি, তাই কাঁচা ফলমূল আর কাঁচা মাংস খেয়েই কাটাতে হত।

—তার মানে ছোটবেলায় তুমি পশু ছিলে তাই না দাছ? বলে সফল। দাছকে পশু বলায় ক্ষেপে যায় বাবাই—তুমি একটু থামবে? হাঁদা পিথেকাস্ কোথাকার।

—ও কিন্তু ঠিকই বলেছে দাছ ভাই। আমি তখন পশুর মতনই ছিলাম। শুধু পশুর তুলানয় আমার মাথার ঘিলুটা একটু বেশি ছিল।

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। কড়্ কড়্ করে মেঘ ডাকছে। চিড়িক চিড়িক নীল বিছ্যুৎ খেলে যাচ্ছে আকাশের এ পার ও পার।

দাছ আপন মনে বলে চলেছেন—পৃথিবীর চেহারাটাই তখন ছিল অন্য রকম। কখনো প্রচণ্ড ভূমিকম্প, কখনো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, কখনো বরফের যুগ—এই সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে চলতে হত আমাদের। যারা এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে নি তারা একদম মরে গেল। আমি কিন্তু দিব্যি মানিয়ে নিয়েছিলাম। তাই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর পরও আজ বেঁচে আছি।

—তুমি বড় হলে কবে দাছ? বাবাইয়ের জিজ্ঞাসা।

—এইতো মাত্তর সেদিন। মানে প্রায় লাখ দশেক বছর আগে। সেই সময়েই আমার চেহারাটাও বেশ একটু পাল্টে গেল। তখন আমারই মতন প্রায় একই চেহারার আরো যারা ছিল; আমার

সেই সব ভাই বেরাদারদের নাম শুনলে তোমরা এখন তাজ্জব হয়ে যাবে।

—কেমন নাম শুনি শুনি। সফল আর বুম্বার আগ্রহ।

—যেমন ধর হাইডেলবার্গ, সিনানথ্ পাস, পিথেকানথ্ পাস এই সব আর কি। দাদু উত্তর দেয়।

—অমন বিদ্‌ঘুটে বিদ্‌ঘুটে নাম রাখল কে দাদু? খুক খুক করে হেসে প্রশ্ন করল বুম্বা।

—কেন ঐ বিজ্ঞানীরা। ওদের নামগুলোই ও রকম কঠিন কঠিন। আসলে কি জান তো, ঐ নামগুলোর সঙ্গে বিশেষ বিশেষ কতগুলো জায়গার সম্পর্ক আছে। যেমন হাইডেলবার্গে আমার যে সব ভাই বেরাদাররা ছিল তাদের নাম হাইডেলবার্গ মানুষ, আবার চীন দেশে আমার যে সব আত্মীয়রা ছিল তাদের নাম সিনানথ্ পাস। এই রকম আর কি।

সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ওর মা ছাতা নিয়ে বাবাইদের বাড়ি এসেছিলেন। তিনিও কখন যেন পিছনে বসে গল্পে মজে গেছেন। বাইরে বৃষ্টি এখনো কমেনি।

—তবে হ্যাঁ—দাদু বলছে—আজ থেকে প্রায় তিন লক্ষ বছর আগে আমার নাম ছিল নিয়ানডার্টাল মানুষ। জার্মানিতে নিয়ানডার্টাল উপত্যকায় ছিল তাদের বাস। আমার সেই নিয়ানডার্টাল অবস্থার পর কেটে গেল হাজার হাজার বছর। তারপর এখন তোমরা আমার যে চেহারা দেখছ সেই চেহারা পেলাম আমি। এত সহজে কি আমি এত বুড়ো হয়েছি? কথা শেষ করে দাদু মিট মিট করে হাসতে লাগল।

সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল দাদুর বয়েসের হিসেবটা বুঝে নেবার পর। তারপর বুম্বা জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা দাদু, সেই ছোটবেলায় তোমার সবচেয়ে আনন্দ হয়েছিল কবে মনে আছে?

—অত দিনের কথা কারো মনে থাকে নাকি? বলে বাবাই।

—সত্যি, দাদুভাই ঠিক বলেছে। অতদিন আগের কথা মনে

রাখা খুবই মুস্কিল। তবে হ্যাঁ, সব থেকে আনন্দ হয়েছিল সেই দিন, যে দিন দু পায়ে দাঁড়িয়ে প্রাণ খুলে হাত তালি দিতে পেরেছিলাম। বলে দাদু।

—কেন হাত তালি দেওয়া কি আর এমন কঠিন কাজ যে, হাত তালি দিয়ে তোমার এত আনন্দ হল? সফল জিজ্ঞাসা করে।

—হাত তালি দেওয়াতে কি আর আনন্দ? আনন্দ তো আসলে হাত দু'টো একদম স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করতে পারলাম বলে। দু হাত দিয়ে গাছের ডাল ধরে থাকলে কি হাত তালি দেওয়া যেত? এতদিন তো প্রায় চার হাত পায়ে ভর দিয়েই চলতে হত, হাত দিয়ে কোনো কাজই করতে পারতাম না। কিন্তু হাত দুটো যখন স্বাধীন হল, তখন আর আমায় পায় কে? হাত দিয়ে বাসা তৈরি করতে শিখলাম, হাতে পাথর নিয়ে অন্য পশুকে তাড়া করে মারতে পারলাম, পাথর ঘষে ছুঁচলো করে অস্ত্র তৈরি করতে পারলাম। মানে হাজারো রকম নতুন নতুন কাজ করতে শিখলাম। আর যত নতুন নতুন কাজ করতে শিখলাম ততই নতুন জ্ঞান হতে লাগল, আর বুদ্ধি খুলতে লাগল। সেই বুদ্ধি আছে বলেই না মানুষ আজ সব প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং বুঝতেই পারছ যে হাতদুটো স্বাধীন করতে পারাটা আমাদের পক্ষে কত জরুরি ছিল। সেই জন্যেই হাত তালি দিয়ে অত আনন্দ হয়েছিল আমার।

সবাই চুপ করে গেল দাদুর কথা শুনে। সবাই যেন নিজের নিজের হাতগুলোকে নতুন করে চিনল। বুম্বাতো বলেই ফেলল—হাত তো তাহলে মস্ত ব্যাপার!

—মস্ত ব্যাপার বৈকি! হাতই তো সব। মানুষের যা কিছু গর্ব তাতো ঐ হাতের জন্যে। হাত দিয়েই মানুষ তার চারদিকের পরিবেশকে নিজের ইচ্ছেমত পাল্টে নেয়। এই ধর—গাছ পালা, নদী নালা, পাহাড় পর্বত সমুদ্র এই সব জিনিসকে মানুষ যে কেটে ফেড়ে দলে পিষে নিজের প্রয়োজন মত ব্যবহার ক'রেছে, সে তো ঐ হাত দিয়েই।

—বাবা যেদিন আমায় ফুটবল কিনে দিয়েছিল সেদিন আমার যেমন আনন্দ হয়েছিল, হাত তালি দিতে পেরে তোমার কি তেমন আনন্দ হয়েছিল দাহু ? সফলের জিজ্ঞাসা ।

দাহু সফলের মার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে বলল—আর একদিনের কথা মনে পড়ছে, সেদিন আমার কী আনন্দই যে হয়েছিল সে আর কি বলব !

—কোন দিন দাহু, কোন দিন ? বাবাইয়ের জিজ্ঞাসা ।

—তখন তো আমরা বনে জঙ্গলে আর পাহাড়ের গুহায় থাকতাম । বনের শুকনো গাছের ডালে ডালে ঘসা লেগে প্রায়ই আগুন লেগে যেত সারাটা বনে । তাকে বলে দাবানল । আমরা তখন আগুন জ্বালতে পারতাম না তাই কাঁচা কাঁচা খেতাম সব কিছু । কিন্তু একদিন হয়েছে কি হুটো নুড়ি পাথরে ঠোকাঠুকি করতে করতে দেখি আগুন জ্বলছে । সেই আগুনে শুকনো পাতা আর কাঠ কুটো পড়তেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল । ব্যস, আগুন জ্বালতে শিখে গেলাম । আগুন জ্বালতে শিখে আমার জীবনটাই বদলে গেল । নিজের খাবারগুলো আগুনে পুড়িয়ে, মানে প্রায় রান্না করে খেতে শিখলাম । সে যে কী সুস্বাহু সে আর কি বলব ? একদিন একটা পাঁঠার ঠ্যাং পুড়িয়ে খেয়েছিলাম । আহা, তার স্বাদ যেন এখনো জিভে লেগে আছে আমার ।

পোড়া মাংস খাবার কথা শুনে ঘেন্নায় সবার নাক মুখ সিঁটকে উঠল । কে যেন মন্তব্য করল—দাহু একটা রাক্ষসানথ পাস ।

দাহু ভাগ্যিস মন্তব্যটা শোনেনি । না হলে অভিমান করে গল্পই থামিয়ে দিত । শুনতে পায়নি বলেই দাহু না থেমেই বলে চলেছে—গাছে বসে আমরা ফল খেতাম সে তো আগেই বলেছি । ফল খেয়ে আঁটি আর বিচিগুলো ফেলতাম নীচের মাটিতে । একদিন দেখি কি সেই বিচি থেকে একটু একটু করে গাছ বেরচ্ছে । ব্যস, আর যাবে কোথায় ! আমার বুকের উপর থেকে যেন একটা পাথর সরে গেল ।

—কেন বীজ থেকে যে গাছ হয় এটাও জানতে না তুমি? দাদুর মূর্খতা দেখে বাবাই অপমানিত বোধ করে।

—জানতামই না তো। কিচ্ছুটি জানতাম না তখন। যখন জানলাম তখন নিজেই ফলের গাছ তৈরি করতে লাগলাম আর খেতে লাগলাম। এত বড় আনন্দের দিন জীবনে খুব কমই এসেছে আমার বুঝলে দাদুভাই! —বলে দাদু হাসতে লাগল।

সফলের মা পিছন থেকে বললেন—মানুষের প্রায় দুই কোটি বছরের ইতিহাস যে এমন সুন্দর গল্পের মত করে বলা যায়, তা না শুনলে সত্যিই বিশ্বাস হত না আমার।

এতক্ষণ সবাই চোখ গোল করে শুনছিল। এবার দাদুকে আক্রমণ করল সবাই—ও! নিজের ছোটবেলার নাম করে তুমি মানুষের ইতিহাস বললে দাদু তাই না? দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা!

ততক্ষণে গল্প শেষ। দাদু হাসতে হাসতে উঠে পড়ল। বাইরে বৃষ্টিও এখন একদম থেমে গেছে।

আজব সিন্দুক

নিশুতি রাত। বাইরে চলছে তুমুল বৃষ্টি, মেঘের ডাক আর ঝড়ো হাওয়া। বাবাইয়ের ঘুম ভেঙে গেল। দেখল তার গায়ে কখন যেন মা একটা চাদর ঢেকে দিয়েছে। সবাই আঘোরে ঘুমচ্ছে। হঠাৎ ঘরের মধ্যে সরু সূতোর মত এক চিলতে সন্দেহজনক আলো লক্ষ্য করল বাবাই। ঘরে চোর ঢুকল নাকি? সদ্য গোয়েন্দা গল্প পড়া বাবাইয়ের সন্ধানী মনটা ঝিকমিক করে উঠল। ছাদের কাছের দেয়াল ফুটো করে ইলেক্ট্রিক তারটা পাশের ঘর থেকে এই ঘরে এসেছে। আলোটা আসছে ঐ ফুটো দিয়েই। পাশের ঘরটা পড়ার ঘর। আলো আসছে ঐ ঘর থেকেই।

পা টিপে টিপে পাশের ঘরে ঢুকেই দেখে এ বাড়ির সেই বুড়ো

Acc No — 15447

চোরটা টেবিলের উপর মোটা মোটা সব বই নামিয়ে কি যেন পড়ছে। টেবিলে জ্বলছে টেবিল-ল্যাম্প। স্মুতোর মত আলোটা তারই। বাবাই ছুটে গিয়ে ঐ মনোযোগী চোরটাকে মারল এক ধাক্কা—চোর চোর চোর কোথাকার। চোরটা তো চমকে ধড়মড় করে উঠল—আরে দাদু ভাই, এত রাতে তুমি এখানে কেন? যাও শুতে যাও।

—না যাব না আমি শুতে। তুমি বুড়ো চোর একটা। আমি আজ চোর ধরে ফেলেছি। বাবাইয়ের স্পষ্ট জবাব।

পাশের ঘরের দেয়াল ঘড়িতে জলতরঙ্গ বেজে উঠল। রাত তিনটে। আশ্চর্য হয়ে দাদু জিজ্ঞাসা করে—কিন্তু আমি চুরিটা করলাম কি? চোরটা হলাম কিসে তা তো বললি না দাদুভাই!

—এখন বুঝতে পেরেছি তুমি এত কথা জানো কি করে। রাত্তির বেলায় সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তুমি এখানে এসে চুরি করে করে বই পড়। তাই তুমি চোর। আচ্ছা দাদু, বইতে সব সব সব কথা লেখা থাকে? বাবাইয়ের জিজ্ঞাসা।

—হ্যাঁ দাদু ভাই, বইতে সব কথা লেখা থাকে। মানুষ বই পড়ে অনেক কথা জেনে আবার নতুন নতুন জিনিস করতে শেখে, নতুন কথা ভাবে, মাথার মধ্যে নতুন কথা জমে ওঠে। তখন আবার সেই নতুন কথা নিয়ে বই লেখা হয়। অন্য মানুষরা আবার তখন কথা শিখে নতুন নতুন কাজে নামে।

বাবাই এবার দাদুর কোলে উঠে বসে। দাদু বুঝল ওর আর এক্ষুনি শুতে যাবার মতলব নেই। আজকের পড়াশুনোর দফা রফা। তাই চশমটা খুলে টেবিলে রেখে নাতিকে নিয়ে চাদর জড়িয়ে বসল দাদু। কোলে বসেই বাবাই এক সাংঘাতিক প্রশ্ন করে—আচ্ছা দাদু, মানুষ বই লেখে কেন?

একটু ভেবে দাদু উত্তর দেয়—বই না লিখলে আমরা অন্য দেশের কথা, তারপর বহু বহু কাল আগের কথা—এসব জানব কি করে? এই ধর, তুমি তো ক্ষুদিরামকে দেখ নি, ইংরেজদের দেখ নি, সাজাহানকে দেখ নি। কিন্তু তাঁদের সময়ের লোকেরা অনেক কথা

লিখে গেছেন বলেই এখন তোমরা বই পড়ে সে সব কথা জানতে পারছ। তা ছাড়া একজন মানুষ যদি নতুন একটা কথা ভাবে আর সে কথা যদি সে না লেখে তবে অন্য মানুষ সেই নতুন কথা জানবে কেমন করে? আর নতুন কথা না জানলে নতুন কাজই বা হবে কি করে? কাজের থেকেই আসে নতুন ভাবনা, নতুন ভাবনা গুলো লেখা হয় বইতে, সেই নতুন কথা শিখে আবার শুরু হয় নতুন কাজ। তোমার সেই নিউটন সাহেবের কথা মনে আছে?

—খুব মনে আছে, সেই যার মাথায় আপেল পড়েছিল।

—ঠিক বলেছ। তাঁর মাথায় একটা নতুন কথা জেগে উঠেছিল যে, পৃথিবী সব জিনিসকে তার নিজের দিকে টানছে। সব জিনিসই সব জিনিকে টানছে। তিনি সে সব কথা লিখে ফেললেন। অন্য লোকে সেই লেখা পড়ে সে কথা জানল বলেই তো আজকে মানুষ চাঁদে যেতে পারল। এই জন্যেই বই লেখা দরকার।

ব্যাপারটা বুঝতে পারল বাবাই। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপরই এক মোক্ষম প্রশ্ন করে বসল—আচ্ছা দাদু, তুমি যে বলেছিলে লেখাপড়া তো দূরে থাক মানুষ একসময় কথাবার্তাই কইতে পারত না। তারা তো তখন বইও লিখতে পারত না। তারপর জীব-জন্তু, গাছপালা এসব যখন কিছুই সৃষ্টি হয়নি, তখনও তো কেউ বই লেখে নি। তবে তাদের কথা কেমন করে জানল মানুষ? সে সব কথা বইতে কেমন করে লেখা হল?

প্রশ্ন শুনে দাদু প্রশংসার দৃষ্টিতে নাতির দিকে একটু তাকিয়ে বাঁধানো দাঁতের নীচের পাটিটা সামনে একটু ঠেলে ফ্যাক-ফ্যাক করে হাসতে লাগল। বাবাইয়ের এই হাসি চেনা হয়ে গেছে। কোনো আশ্চর্য কথা বলবার আগে দাদু অমন দাঁতটা ঠেলে হাসে। বাবাই তাই বেশ আরাম করে দাদুর কোলের মধ্যে আরো ঢুকে বসে। বাইরে তখনো বৃষ্টি হচ্ছে।

—একটা বিরাট আর অদ্ভুত সিন্দুক আছে। সেই সিন্দুকের মধ্যে আছে নানা ধরনের হাজারো খবর। যারা বই লিখতে পারত না,

কিংবা যারা বই লেখে নি তাদের আবার খবরও আছে সেই আজব সিন্দুকটার ভিতর। এখনকার মানুষেরা সেই সিন্দুক খুলে সে সব খবর জেনে নিয়েছে, তারপর লিখে ফেলেছে বইতে। —জানায় দাদু।

—সিন্দুক !!! কত বড় সিন্দুক !! কোথায় সিন্দুক ! কিসের সিন্দুক? এক সঙ্গে হাজারো জিজ্ঞাসা আছড়ে পড়ে বাবাইয়ের মুখ থেকে।

—হ্যাঁ রে, সে এক বিশাল বিরাট সিন্দুক। আমাদের সবার চোখের সামনেই আছে সেটা, কিন্তু আমরা সবাই দেখতে জানিনা বলেই দেখতে পাইনা। সেটা কিন্তু বাড়ির সিন্দুকটার মতন লোহার সিন্দুক না। সেটা হল এই বিশ্বপ্রকৃতির সিন্দুক।

কথাটা নাতির কাছে যথেষ্ট পরিষ্কার হল না বুঝতে পেরে দাদু আবার বলল—আসল কথা কি জানিস, এই পৃথিবীর মাটি, গাছ-পালা এসব দিয়েই তৈরি সেই আজব সিন্দুকটা। প্রকৃতিই হাজার লক্ষ কোটি বছরের অনেক অনেক কথা নিজের বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।

—কেমন করে লুকিয়ে রাখে?

—ধর সেই মহেঞ্জোদড়ো হরপ্পার কথা। সে সব কথা তুমি তো পড়েছ বইতে। কিন্তু সে সব তো আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগের কথা। সে কথা মানুষ জানল কি করে? আমাদের এই পৃথিবীর মাটি-মা নিজের বুকের মধ্যে তখনকার বাড়িঘর, বাসন-পত্র থেকে শুরু করে তখনকার মানুষের গয়নাগাঁটি পর্যন্ত যত্ন করে রেখেছিল বলেই না জানতে পারলাম মাটি খুঁড়ে। তবে এই পৃথিবীটাকে সিন্দুক ছাড়া আর কী বলা যাবে?

—কিন্তু যখন মানুষ বাড়ী ঘর করতে শেখেনি, কিংবা সবেমাত্র অনেক কষ্টে পাথর ঠুকে একটু একটু আগুন জ্বালতে শিখেছে তখনকার কিইবা এই পৃথিবীর সিন্দুকে থাকবে? জিজ্ঞাসা করে বাবাই।

তখনকার মানুষ যে গুহায় থাকত সেই গুহা থাকবে। তখনকার মানুষ আবার অনেক কষ্টে আগুন জ্বালত বলে একবার আগুন

জ্বালিয়ে সেটা আর নিভতে দিত না। কাঠকুটো দিয়ে বছরের পর বছর জ্বালিয়ে রাখত। তাই বিশাল বিশাল ছাইয়ের স্তূপ থাকবে। আর একটা মজার জিনিস থাকে, সেটা কি জানিস? তখনকার মানুষ, পশু পাখি এই সবের কঙ্কালগুলো হাজার হাজার বছর ধরে মাটির চাপের চোটে পাথর হয়ে যেমন ঠিক তেমনটিই রয়ে যায়। ইংরাজিতে একে বলে ফসিল। ফসিল দেখে বিজ্ঞানীরা তখনকার মানুষ, পশু পাখি, জীব জন্তু সবার বিষয়ে অনেক খবর জেনে যায়। যেমন ধর আজ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার ডাইনোসারাসের মত বিশাল বিশাল জন্তু, কিংবা সেই নিয়ানডার্টাল মানুষ—এদের কথা আমরা জানতেই পারতাম না তাদের ফসিল না পাওয়া গেলে।

বাবাই অবাক হয়ে দাদুর কথা শুনছিল। সে যেন মনে মনে আশ্চর্য সিন্দুকটার আপাদমস্তক দেখতে পাচ্ছিল। এবার হঠাৎ প্রশ্ন করল—সবই তো মাটির নীচের সিন্দুকে ঢাকা পড়ে আছে। কিন্তু মাটি খুঁড়ে যখন সে সব জিনিস পাওয়া যায় তখন কেমন করে বোঝা যাবে কোনটা আগের আর কোনটা পরের?

—আচ্ছা বল তো, আমাদের যে বড় সিন্দুকটা আছে তার একেবারে উপরে কি আছে? মানে সিন্দুক খুলেই কি দেখতে পাব? দাদুর সহাস্য জিজ্ঞাসা।

—লেপ কম্বল এই সব শীতকালে গায়ে দেবার জিনিস।

—আচ্ছা বেশ। একদম তলায় মানে সিন্দুকের মেঝেতে কি আছে? কেন সব ছেঁড়া জামা কাপড়, পুরনো কাঁথা, এই সব।

—কিন্তু কথা হল ছেঁড়া জিনিসগুলো একেবারে তলায়, আর ভাল লেপ-কম্বল সব উপরে এল কি করে?

—কেন যেটা আগে রাখা হয়েছে সেটা তলায়, আর যেটা পরে রাখা হয়েছে সেটা উপরে আছে। বাবাইয়ের সুস্পষ্ট উত্তর।

—প্রকৃতির সিন্দুকের বেলাতেও ঠিক তেমনি হয়। —দাদু বলে —মাটিরও অনেক স্তর আছে। যত পুরনো দিনের চিহ্ন হবে সেগুলো তত নীচের স্তরে পাওয়া যাবে। উপরের স্তরে পাওয়া যাবে পরের

যুগের জিনিস। আবার একই স্তরে যদি বিভিন্ন জিনিস পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে ঐ একই যুগে ঐ সব বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার হত। কোনটা নতুন যুগের আর কোনটা পুরনো যুগের তা এই ভাবেই বোঝা যায়। স্পেন দেশে ক্যাস্টিলো নামে এক গ্রামে একটা গুহা আবিষ্কার হয়েছে। সেখানে যুগে যুগে মানুষ এসে বাস করে গেছে। সেই গুহার মাটির স্তরে স্তরে স্পষ্ট ভাবে নানা যুগের নানা মানুষের সব চিহ্ন পাওয়া গেছে।

—কিন্তু দাদু, কোনটা ঠিক কত বছর আগেকার জিনিস তা বোঝা যাবে কেমন করে? বাবাইয়ের বিস্মিত প্রশ্ন।

—আজকাল বিজ্ঞানীরা তাও বলতে পারেন। এক ধরনের তেজস্ক্রিয় অঙ্গার আছে, বিজ্ঞানীরা তাকে বলেন 'সি-কোরটিন্' (C^{14})। ঐ সি-কোরটিন্ এর সাহায্যে বিজ্ঞানীরা কোনো ফসিল বা অন্য কোনো জিনিসকে পরীক্ষা করে বলে দিতে পারেন সেটা কতকাল আগের। তাহলেই বুঝতে পারছ এই প্রকৃতির সিন্দুক কি সাংঘাতিক জিনিস। ঐ সিন্দুকের মধ্যে থেকেই পণ্ডিতেরা নতুন নতুন সব খবর খুঁজে বের করে আনেন। তারপর অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নির্ভুল সিদ্ধান্তে এলে তাঁরা বইতে সে সব কথা লিখে দেন। আর আমরা সাধারণ মানুষরা সে সব জানতে পারি বই পড়ে।

দাদুর কোলে বসে বাবাই আপন মনে ভাবছিল এই আশ্চর্য সিন্দুকটার কথা। ভাবছিল এই সিন্দুকের খবরগুলো যারা বুঝতে পারে তাদের কি মজা! এমন সময় হন্ত দন্ত হয়ে এ ঘরে ঢুকল বাবাইয়ের মা। —বাবাই তুমি না বলে উঠে এসেছ কেন? জেগে উঠে আমি খুঁজে পাই না তোমায়। কখন উঠেছ তুমি? মায়ের উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা।

দাদু বাবাইয়ের দিকে একটু চোখ টিপে বলল—এই এক্ষুনি বৌমা, এক্ষুনি। ...বৃষ্টিটাও ধরে এল, ভোরও হয়ে গেছে, দেখ তো একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে পার কিনা।

—মা তোমার চোখের সামনেই একটা বিরাট সিন্দুক রয়েছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ? বাবাই বিজ্ঞতা প্রকাশ করে।

দাদুর কাছে এই শেষ রাত্তিরে উঠেই বুঝি নতুন গল্প শোনা হল ?

মা আর দাঁড়ালেন না। চায়ের ব্যবস্থা করতে গেলেন।

বিজ্ঞের মত বাবাই বলে—আচ্ছা দাদু, আমরাও তো একসময় সিন্দুকে চলে যাব তাই না ? অন্য মানুষেরা আবার পৃথিবীর সিন্দুক খুঁজে খুঁজে আমাদের চিহ্ন বের করবে !

দাদু নাতিকে বুকে জড়িয়ে বলল—হ্যাঁরে দাদু ভাই, যাবই তো। পুরনোরা চলে যাবে, আর নতুনরা আসবে—এইতো নিয়ম।

—তোমাকে কিন্তু দাদু একদিন ঐ তেজস্ক্রিয় অঙ্গার মানে বিজ্ঞানীরা কাকে বলেন 'সি-ফোরটিন্', তাই দিয়ে পরীক্ষা করে আমার জানতে হবে তোমার ঠিক বয়েসটা কত।

বাবাইয়ের কথা শুনে দাদু হাসতে লাগল—ফ্যাক ফ্যাক ফ্যাক।

চোরের উপর গোয়েন্দাগিরি করতে এসে বামাল সহ এমন একটা আস্ত সিন্দুকের সন্ধান পেয়ে যাবে বাবাই তা ভাবতেই পারেনি।

আজব ফাঁদ

টিঙ্কু বাবাইদেয় ক্লাসের ফার্সট বয়। বাবাইকে সে ঠাকুরমার ঝুলির গল্পটা বলছিল—মন্ত্রীপুত্তুর, কোটালপুত্তুর আর সদাগর-পুত্তুরকে খেয়ে রাক্ষসী যখন রাজপুত্তুরকে খেতে এল তখন বনের গাছ আর পাথর সবাই চিৎকার করে উঠল—পালাও, রাজপুত্তুর পালাও, এক্ষুনি রাক্ষুসী তোমায় খাবে···

গল্পটা বেশ শুনছিল বাবাই। কিন্তু গাছ আর পাথর যখন 'পালাও-পালাও' বলে চিৎকার করে উঠল তখনই বাবাইও বসল বেঁকে—গাছ আর পাথর কেমন করে চিৎকার করবে ? ওদের কি ভাষা আছে ? টিঙ্কু বলে—আছে। আর বাবাই বলে—নেই। এর আগে মার কাছে গল্প শুনতে গিয়েও দেখেছে গাছ, লতা, পশু, পাখি সব কথা বলছে। কিন্তু ব্যাপারটা খেয়াল হয়নি। আজই

হঠাৎ কি মনে হতেই ঝগড়া বাধিয়ে বসেছে। ফুটবল যদি হঠাৎ খেজুর কাঁটায় লেগে ফুটো না হয়ে যেত তাহলে হয়তো ঝগড়া বাধতনা, দিব্যি খেলা হত। ফুটবল ফুটো হয়ে খেলা বন্ধ হতেই গল্প করতে গিয়ে এই বিপত্তি।

ঝগড়াটার মীমাংসা করার জন্যে দুজনেই যখন একজন বয়স্ক লোককে খুঁজছে, যিনি সঠিক উত্তরটা দিতে পারেন, ঠিক সেই সময়েই বাবাই যেন হাতে স্বর্গ পেল। সে দেখল মাঠের পাশ দিয়ে বিকেলের হাওয়ায় গুটি গুটি করে বেড়াতে যাচ্ছে দাদু। দু জনেই ছুটে গিয়ে চেপে ধরল দাদুকে। শিবতলায় দাদুর বুড়ো বুড়ো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাটাই মাটি হল আজ।

টিঙ্কু ভেবেছিল দাদু বাবাইয়ের পক্ষ টেনেই কথা বলবে। কিন্তু অনেক ভেবে দাদু যখন বলল—কথা বলতে পারুক আর না পারুক ভাষা বোধ হয় সবারই আছে ; ইট কাঠ গাছ পাথর জীব জন্তু সবার। তখন টিঙ্কু আনন্দে লাফিয়ে উঠল—দেখেছিস, আমি বলেছিলাম না? বাবাই একটু বিমর্ষ হয়ে পড়লেও বলল—কথাতো আর সবাই বলতে পারেনা।

—তা অবশ্য পারে না। দাদু জানায়।

—দেখলি তো, কথাই যদি না বলতে পারবে তবে গাছ আর পাথর রাজপুত্তুরকে 'পালাও পালাও' বলবে কেমন করে ? বাবাইয়ের আনন্দ।

তর্কটায় প্রায় জিতে গিয়েও আনন্দটা কেমন যেন মিইয়ে গেল টিঙ্কুর। তাই দাদুকে চেপে ধরল—কথাই যদি বলতে না পারবে তাহলে ভাষা থাকবে কেমন করে ?'

—তুমি তো দাদুভাই বড় ভাল কথা বলেছ। আসলে কি জান, একজন আর একজনকে কোনো কিছু জানায় যে জিনিসের সাহায্যে তা যদি ভাষা হয়, তাহলে সবারই ভাষা আছে।

—সে আবার কেমন কথা ? টিঙ্কুর বিস্ময়।

দাদু হঠাৎ যেন ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দিতে চায়। তাই অন্য কথা

পাড়ে। বলে—এই গরমে এই মাঠটায় বসতে বেশ আরাম। খুব হাওয়া আছে। টিঙ্কুদের বাড়িটা এমন ঘুপচি জায়গায় যে, একটুও হাওয়া যায় না।

—আমাদের বাড়িটা খুব ভাল জায়গায়, কত হাওয়া হচ্ছে তাই না দাদু? বাবাই গর্ব প্রকাশ করে।

—ঐ তো আমাদের বাড়িতেও কত হাওয়া হচ্ছে। লাফিয়ে উঠে বলে টিঙ্কু।

দাদু একটু মিট মিট করে হেসে বলল—তোমরা এত দূরে বসে কি করে বুঝলে যে তোমাদের বাড়িতেও হাওয়া হচ্ছে?

—কেন বাড়ির উঠোনের অশ্বথ গাছটা কেমন নড়ছে দেখতে পাচ্ছ না? বাবাইয়ের অকাট্য যুক্তি।

—আমাদের বাড়ির নারকোল গাছটাও তো কেমন দুলছে দেখতে পাচ্ছিস না? টিঙ্কুর পাল্টা জবাব।

—তাহলেই দেখ, গাছগুলোর যদি ভাষাই না থাকবে তাহলে হাওয়ার খবর অত দূর থেকে তোমাদের জানাল কেমন করে? সেই জন্যেই বলছিলাম সবাই কথা না বলতে পারলেও ভাষা সবার আছে।

বাবাই আর টিঙ্কু যেন বোকা হয়ে যায়। দুজনেই ভাবতে থাকে—তাইতো! তাইতো!!

—মেঘ দেখে বুঝি বৃষ্টি হবে, সুতরাং মেঘের ভাষা আছে। ধোঁয়া আমাদের বলে দেয় কোথাও আগুন জ্বলছে, সুতরাং ধোঁয়ার ভাষা আছে।

এমনি অনেক কথা বলার পর একটু থেমে বলল—এগুলোকে অবশ্য ঠিক ভাষা বলা যায়না।

—সে আবার কি কথা! দুজনেই অবাক।

—আসলে কি জানিস, ওরা তো কাউকে খবর দেবার উদ্দেশে খবর দেয় না। গাছ বাতাসে এমনিই নড়ে, আমাদের বাতাসের খবর দেবার জন্যে নড়েনা। মেঘ বাতাসে এমনিই ওড়ে, বৃষ্টির খবর

দেবার জন্যে ওড়ে না। তাছাড়া ওরা কারো সঙ্গে কথাবার্তা চালাতেও পারে না। গাছ বাতাসের খবর দিল ঠিকই, কিন্তু ওকে যদি জিজ্ঞেস কর—ও গাছ, বাতাসে তোমার ভাল লাগছে? তা হলে কিন্তু তার উত্তর গাছ, পাথর, মেঘ কেউ দিতে পারবে না। তাই একে ঠিক ভাষা বলেনা, বলে—চিহ্ন। ইংরেজিতে বলে—সাইন। গাছ নড়ার চিহ্ন দেখে বুঝি বাতাস হচ্ছে। ভিজে মাটিতে পায়ের চিহ্ন দেখলে বুঝি এখানে কেউ এসেছিল। এই চিহ্ন আর সংকেতের মধ্যে আবার তফাৎ আছে।

টিঙ্কু আবার এক গোলক ধাঁধায় পড়ে গেল দাদুর কথায়—সংকেতটা আবার কি জিনিস দাদু?

—কোনো কিছুকে যদি সবাই মিলে একটা বিশেষ কিছু আলাদা মানে করে নেয় তবে তাকে সংকেত বলে। যেমন ফুটবল খেলায় রেফারি 'পিঁ-ই-ই' করে বাঁশি বাজালে খেলা থামিয়ে দিতে হবে, এটা সব খেলোয়াড় মিলে ঠিক করে নিয়েছে। কিংবা ধর লাল রঙ, তার নিজের কোনো মানে নেই। কিন্তু মানুষ ঠিক করে দিয়েছে লাল আলো জ্বললে গাড়ি থামিয়ে দিতে হবে। তাই সিগন্যালের লাল আলো একটা সংকেত, রেফারির বাঁশি একটা সংকেত; ট্রাফিক-পুলিশের হাতের ওঠা নামা, টেলিগ্রাফের টরে-টক্কা এরাও সংকেত। এমনি ধারা কত হাজার হাজার সংকেত যে মানুষ ব্যবহার করে তার ঠিক নেই। আর সব সংকেতই ব্যবহার হয় অন্য কাউকে কিছু জানানোর জন্যেই। কিন্তু গাছ পালা ইট কাঠ মেঘ কাউকে কিছু জানানোর জন্যে কিছু করে না। তারা যা করে এমনিই করে। এই খানেই হল গাছ-ইট-মেঘের ভাষার সঙ্গে পশু পাখির ভাষার তফাৎ।

বাবাই এবার লাফিয়ে ওঠে হঠাৎ—পশু পাখিরও ভাষা আছে নাকি দাদু?

নিশ্চয়ই, পশু পাখির ভাষা তো আছেই। গাছ পালার চেয়ে অনেক ভালো ভাষা, সত্যিকারের ভাষা। দাদু উত্তর দেয়।

দাদুর কথা শুনে টিঙ্কু যেন একটু বিজয়ীর হাসি হাসে।

সে বলে—ওরা তো আমাদের মতই কথা বলতে পারে তাই না দাদু ?

—না ঠিক মানুষের মতন পারে না। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন মৌমাছি, বাঁদর, মুরগিছানা, ডলফিন এদের সবারই ভাষা আছে। পশুপাখিদের মধ্যে এদের ভাষাই বেশ উন্নত। তবে পশুপাখির ভাষা প্রায় সংকেতের পর্যায়েই পড়ে।

—মুরগির কথা, ডলফিনের কথা সব বুঝতে পার তুমি ? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে বাবাই।

—না না আমি পারিনা, তবে বিজ্ঞানীরা পারেন। তাঁরা বলেন বেবুনদের মোট সতেরটা শব্দ আছে। ঐ শব্দগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়েই ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে। সব থেকে আশ্চর্য হল কাকদের ভাষা। ইংলণ্ডের মানুষের ভাষা আর ভারতবর্ষের মানুষের ভাষা যেমন আলাদা। তেমনি শহরের কাক আর গ্রামের কাকের ভাষা আলাদা। দু জন দু জনের ভাষা বোঝেনা। মানুষদের যেমন দোভাষী থাকে, ঠিক তেমনি কাকদেরও দোভাষী থাকে। এমন অনেক কাক আছে যাদের শহর আর গ্রামের মধ্যে যাতায়াত আছে, ওরা দুই জায়গার ভাষাই জানে। দোভাষীর কাজটা ওরাই করে।

বাবাই বলে—ভাষায় যখন কাকদের অত দখল, তখন একটু অঙ্কটা শিখে নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে গেলেই তো পারে।

বাবাইয়ের কথায় টিঙ্কু হেসে উঠল। ঝগড়ার কথা ওরা ভুলে গেছে। দাদু হাসি থামিয়ে বলল—পরীক্ষা কাকেরা দিতে পারবে না, কারণ ওদের ভাষার আবার একটু মুস্কিল আছে।

—কেন আবার কি মুস্কিল হল ? টিঙ্কু জিজ্ঞাসা করে।

—পশুপাখিরা চোখের সামনে যা দেখতে পায় না তার কথা ওরা বলতে পারে না। গতকাল কি হয়েছিল, এমন কি এক মিনিট বা এক সেকেণ্ড আগের কোন কথাও ওরা বলতে পারেনা। তেমনি এক মিনিট বা এক দিন পরে কি হবে, বা কি করবে সেটাও ভাষায় প্রকাশ করতে পারেনা। মানে পশুপাখীরা অতীতকাল আর ভবিষ্যত

কাল বলে কিছু জানেই না। ওদের চোখের সামনে যা আছে শুধু তাই নিয়ে ওদের সেই মুহূর্তের জগৎটাকেই ওরা বোঝে, আর সেই বিষয়ের কথা বলতে পারে। সুতরাং গতকালকের পড়া আগামী কালকের পরীক্ষার খাতায় ওরা লিখবে কি করে।

—তার মানে আমারা এই যে কাক, বেবুন ডলফিন এরা আমাদের চোখের সামনে না থাকলেও ওদের নিয়ে কথা বলছি, পশুপাখি তেমন পারে না এই তো? টিঙ্কু ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝে নিতে চায়।

—ঠিক বলেছিস দাদু। এই খানেই তো মানুষের ভাষার সঙ্গে পশুপাখির ভাষার তফাৎ। মানুষ তার ভাষা দিয়ে অতীতকে মনে রাখে, ভাষার সাহায্যেই বর্তমান কাজকে কাজে লাগায়, আবার ঐ ভাষার দ্বারাই ভবিষ্যতে কি করবে তাও ঠিক করে রাখে। সেই জন্যেই তো মানুষ আজ এত সভ্য, আর অন্য সবাই হেরে গেছে মানুষের এই দুর্দান্ত ক্ষমতাটার কাছে।

—ভাষা ছাড়া মানুষ কি কিছুই চিন্তা করতে পারেনা? বাবাই জিজ্ঞাসা করে।

—পারেই না তো। —দাদু বলে—চিন্তা করা মানেই হলে মনে মনে নানারকম যুক্তি খাড়া করা। ভাষা ছাড়া মনে মনে সেই যুক্তি কেমন করে খাড়া করবে? ধর একদিন খেলতে খেলতে বেশ সন্ধে হয়ে গেছে। মাও বাড়ি গেলেই বকবেন। তোমরা তখন মনে মনে ভাবতে থাক মা কি কি বলবেন, আর তার উত্তরে তোমরাই বা কি কি বলবে। ভাষা ছাড়া তা কি ভাবা যায়?

টিঙ্কু আর বাবাই দুজনেই ভাষা ছাড়া কিছু একটা ভাবা যায় কি না চিন্তা করতে লাগল। কিন্তু দেখল এই চিন্তা করার চিন্তাটাও ভাষা ছাড়া করা যাচ্ছে না মনে মনে। এই ব্যাপারটা যে এত গুরুত্বপূর্ণ তা কিন্তু ওরা জানত না এতদিন। তাই এখন ওরা খুব আশ্চর্য হল।

একটু পরে দাদু বলল—আজ দেখছি ফুচকাওয়ালাটাও বসেনি।

এতক্ষণ বকবকানির পর বেশ ঝাল আর টক তেঁতুলের জল দিয়ে কয়েকখানা ফুচকা মুখে ফেলতে পারলে গল্পটা জমত বেশ।

ঝালঝাল টকটক তেঁতুলের জলভরা টোপা টোপা ফুচকার কথা শুনে টিঙ্কুর জিভে কুলকুল করে জল এসে গেল। বাবাইয়েরও ভাষার চিন্তা কোথায় চলে গেল। সেও জিভ দিয়ে খুসখুস করে জল টানতে টানতে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল ফুচকাওয়ালাকে দেখা যায় কিনা।

—তুই বড্ড লোভী বাবাই। ফুচকার নাম শুনে জিভে একেবারে জল এসে গেল? বলল টিঙ্কু।

—তুমি আর বল না। তোর জিভে জল আসেনি? তুই তো ভাল করে কথাই বলতে পারছিস না। বাবাই উত্তর দেয়।

দাদু হেসে বলল—এই দেখ, এটাই কিন্তু ভাষার আসল কাজ। দেখ, ফুচকা আমাদের সামনে নেই, আবার 'ফুচকা' এই শব্দটাও কিন্তু আসলে ফুচকা নয়। শুধু 'ফুচকা' শব্দটার দ্বারা আমরা ফুচকা নামে একটা মুখরোচক খাবারকে বুঝি। তাই ঐ শব্দটা শুনেই আমাদের জিভে জল এসে যায়। মানুষের ভাষা এই ভাবেই সমস্ত রঙগন্ধস্বাদ-শব্দস্পর্শ সব কিছুর সঙ্গে একেবারে মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে। সেই জন্যেই আসল জিনিসের বদলে সেই জিনিসের নামটার সাহায্যেই মানুষ সম্পূর্ণভাবে ভেবে নিতে পারে তার কথা। এই জন্যেই পাভলভ নামে একজন বিজ্ঞানী ভাষাকে ইংরেজিতে বলছেন—সেকেণ্ড-সিগন্যাল্। সেকেণ্ড সিগন্যাল্ কেন বলা হল? ফুচকা দেখলে আমাদের জিভে জল আসে তাই ফুচকা নিজে হল ফার্স্ট-সিগন্যাল্ বা প্রথম সংকেত। কিন্তু 'ফুচকা' এই শব্দটা বা কথাটা নিজে ফুচকা নয়, কিন্তু আসল ফুচকার কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে জিভে জল এনে দেয়। তাই এর নাম সেকেণ্ড-সিগন্যাল্ বা দ্বিতীয়-সংকেত।

বাবাইরা ভাবতে লাগল—এ তো মহা মুস্কিলে পড়া গেল! ফুচকা থেকে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর পর্যন্ত সবাই দেখছি আস্তে আস্তে

ব্যাকরণ কৌমুদির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে ;—আরে ভাষা মানেই তো ব্যাকরণ কৌমুদি—ওরা ভাবতে থাকে।

—না না আমি শুধু মুখে আর বক বক করতে পারছি না। মুখে কিছু দেবার দরকার। এই যে, ও ভাই বাদামওয়ালা! দেখি দাও পঞ্চাশ গ্রাম করে তিন জায়গায়। দাদু পয়সা বের করতে লাগল।

বাদামওয়ালা বাদাম মাপছে। এর মধ্যেই টিঙ্কু প্রশ্ন করে বসেছে– কিন্তু এমন যে ভাষা তা মানুষ শিখল কেমন করে দাদু ?

বাদামের দুটো তিনটে দানা মুখে ছুঁড়ে দিয়ে দাদু আবার আস্তে আস্তে শুরু করল—মানুষ যেদিন থেকে সভ্য হতে শুরু করেছে, ভাষাও সৃষ্টি হয়েছে সেদিন থেকেই। মানে মানুষের ভাষার বয়স তার সভ্যতার বয়সেরই সমান। সে যখন অসভ্য তার ভাষাও ছিল ঐ পশুর মতন।

—তা সভ্য হতে গিয়ে ভাষা শিখল কেমন করে ? কে শেখাল তাকে ভাষা ? বাবাই জিজ্ঞাসা করে বাদাম চিবতে চিবতে।

— ব্যাপারটা তাহলে খোলসা করেই বলি। মানুষ যেদিন তার দুটো হাতকে স্বাধীন করে নিতে পেরেছিল সেদিন থেকেই সে সভ্য হতে শুরু করেছে। কিন্তু সভ্য হতে শুরু করা মানে কি ? মানে হল অনেকে মিলে এক সঙ্গে কাজ করতে শুরু করা। এক সঙ্গে শিকার করা, এক সঙ্গে মাছ ধরা, শিকারের জন্যে একসঙ্গে বসে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র তৈরি করা—এইসব আর কি। ঐ এক সঙ্গে দল বেঁধে কাজ করতে গিয়েই হল ভাষার সৃষ্টি।

দাদু আবার একটু ঝাল নুন চেটে নিয়ে বলে—একজন কি চায় সেটা যদি সে আর একজনকে বোঝাতে না পারে তবে এক সঙ্গে কাজ করবে কেমন করে ?

—কাজ করতে গিয়েই মানুষ এত কঠিন ভাষা শিখে গেল ? অবাক হয়ে যায় টিঙ্কু।

—হ্যাঁরে ভাই। তবে এক দিনেই কি আজকের মতন ভাষা

শিখেছে সে? আস্তে আস্তে অনেক বছর ধরে চেষ্টা করে তবেই না শিখেছে। যেমন ধর কোন জিনিস দিয়ে কি করা হবে সেটা বোঝাতে সেই জিনিসগুলোর নাম দরকার সবার আগে। না হলে শিকারের জন্যে বল্লম দরকার, নাকি লাঠি দরকার, নাকি পাথর দরকার বুঝবে কেমন করে? কোন হাতিয়ার দরকার সেটা সবাই যাতে বুঝতে পারে সেই জন্যেই হাতিয়ারগুলোর নাম প্রয়োজন। তাই সে নাম ঠিক হল। আবার কোথায় শিকার করা হবে? পাহাড়ের নিচে নাকি বনের মধ্যে? নাকি ঝর্ণার ধারে? সেটাও বুঝে নেওয়া চাই না হলে সবাই একসঙ্গে এক জায়গায় পৌঁছবে কেমন করে? সুতরাং পাহাড়, বন, ঝর্ণা এই সব জিনিসেরও নাম তৈরি হল। মানে আর কি বিভিন্ন জিনিসের নাম—ব্যাকরণে যাকে বলে বিশেষ্য—তাই সৃষ্টি হল। একটা শব্দ দিয়ে কোনো একটা বিশেষ জিনিসকে চিনে নেওয়া এটাই তো ভাষার সব থেকে বড় কথা।

যেন কিছুই না এমন ভাব করে দাদু বাবাইয়ের ঠোঙা থেকে দু'টা বাদাম তুলে নিয়ে ভাঙতে ভাঙতে বলল—দিন যত যেতে লাগল নানা রকম কাজও বাড়তে লাগল। এখন তো আর শুধু শিকার করলে, চাষ করলে আর মাছ ধরলে কিংবা বসবাস করবার জায়গা তৈরি করলেই হয় না। ও সব করতে গেলে অনেক রকমের হাতিয়ার মানে যন্ত্রপাতিও নিজেদের একসঙ্গে বসে তৈরি করে নিতে হয়। যেমন শিকার করার জন্যে বর্শা, মাটি খোঁড়ার জন্যে শাবল জাতীয় কিছু, পাথর ছুঁচলো করে অন্য নানা ধরনের অস্ত্র তৈরি করা—এইসব আর কি। কাজ যত বাড়তে থাকে কাজগুলোর নামও হয়ে যায় আলাদা আলাদা। না হলে যখন শিকার করতে যাবার দরকার তখন যে কথাটা না বুঝে কেউ যদি জল আনতে যায় তা হলে তো চলবে না। তাই বিভিন্ন রকম কাজ করা বোঝাতে বিভিন্ন রকম শব্দ সৃষ্টি হল—ব্যাকরণে তাকেই তো বলে ক্রিয়া, কি বলিস দাদুভাই?

একটু ঝাল-নুন জিভে দিয়ে টকাস করে একটা শব্দ করে দাদু আবার বলে—এখন কথা হল সবাই মিলে জড়ো হতে হবে এক

জায়গায়। কিন্তু সেটা কোথায়, বড় গাছটার নিচে? নাকি ছোট পাহাড়ের কোলে? আবার যে দুটো পশু আজকের ফাঁদে ধরা পড়ল তাদের মধ্যে শিংওয়ালাটাকে মেরে মাংস খাওয়া হবে? নাকি শিং না গজানো বাচ্চাটার মাংসেই কুলিয়ে যাবে সবার?—এ সব না বোঝাতে পারলে খুবই অসুবিধে। তাই বড় ছোট লম্বা বেঁটে সোজা বাঁকা এমনতর হরেক রকমের শব্দ—ব্যাকরণে যাকে বলে বিশেষণ—তাই সৃষ্টি হল। তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যে বনের মধ্যে বাস করে এমন অনেক মানুষের ভাষায় কোনো শব্দ নেই যার দ্বারা 'গাছ' বোঝায়। শুধু গাছ কথাটা শুনলে তারা হাসে, কারণ সে কথার কোনো মানে নেই ওদের কাছে। ওদের কাছে ছোট-গাছ, বড়-গাছ, লম্বা-গাছ, নিচু-গাছ—এই সব বিভিন্ন ধরনের গাছের জন্যে বিভিন্ন ধরনের শব্দ আছে। কিন্তু শুধু 'গাছ' বোঝাতে কোনো শব্দ নেই। ধর ঐ এস্কিমোরা, ওরা বরফের দেশে থাকে। কিন্তু 'বরফ' বোঝাতে ওদের ভাষায় কোন শব্দ নেই। ওদের ভাষায় গলন্ত-বরফ, জমাট-বরফ, পড়ন্ত-বরফ, ভাসমান-বরফ—এ সব বোঝাতে আলাদা আলাদা শব্দ আছে। তা হলেই বুঝতে পারছ কোনো কোনো মানুষের কাছে বিশেষণ জিনিসটা কি রকম গুরুত্বপূর্ণ।

বনে বাস করে এমন মানুষেরা 'গাছ' বোঝে না, কিংবা বরফে বাস করে এমন মানুষেরা 'বরফ' বোঝে না শুনে টিঙ্কু আর বাবাই তো পুরো থ হয়ে গেছে। ব্যাপারটা টিঙ্কুদের মনে বেশ ধরেছে বুঝতে পেরে দাদু আবার শুরু করে—মানুষের ভাষার সব থেকে বড় গুণ কি জানিস? মানুষ অল্প কয়েকটা শব্দ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বসিয়েই মনের বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করতে পারে—এটা মানুষের মস্ত বড় ক্ষমতা। এই কাজটা যে মানুষেরা যত ভাল করতে পারে তাদের ভাষা তত উন্নত।

দাদু বুঝতে পারে ব্যাপারটা নাতি দুটোর মাথায় ঢোকে নি। তাই ব্যাখ্যা করে বলে—বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখ। ধর মানুষ বাঘ মারে—এই বাক্যটির যা মানে, বাঘ মানুষ মারে—এই বাক্যেরও কি সেই একই মানে?

—মোটেই না দুটোর মানে সম্পূর্ণ উল্টো। চিৎকার করে ওঠে টিঙ্কু আর বাবাই।

—অথচ দেখ দাদুরা, প্রথম বাক্যে যে যে শব্দ আছে, দ্বিতীয় বাক্যেও ঠিক সেই সেই শব্দই আছে। শুধু মাত্র সাজানোর গুণে দুই বাক্যের দু'টা বিপরীত মানে হয়ে। আমাদের ভাষার যদি এই গুণটা না থাকত, যদি আমাদের ভাষাও ঐ জঙ্গলী মানুষ যাদের 'গাছ' বলে কোনো শব্দ নেই, তাদের মতন হত তবে আমাদের ভাষা এত উন্নত হতে পারত না। অত্যন্ত ছোট ছোট মনোভাবের জন্য যদি আলাদা আলাদা শব্দ মানুষকে মনে রাখতে হত তবে তো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শব্দের ভারে ভাষাটা মানুষের কাছে একটা বোঝা হয়ে উঠত। এই জন্যেই উন্নত মানুষের ভাষাও উন্নত, আর কম সভ্য মানুষের ভাষা অনুন্নত।

টিঙ্কু আর বাবাই এবার ব্যাপারটা বেশ খোলসা করে বুঝতে পারে। শব্দগুলোকে সাজিয়ে বাক্যের মধ্যে রাখা—এটা তো সম্পূর্ণ ব্যাকরণের ব্যাপার। দু জনেই ব্যাকরণের প্রয়োজনটা এবার জলের মত বুঝতে পারে। যুক্তি আর মনোভাব অনুসারে বাক্যের মধ্যে শব্দ সাজাতে শেখানোই তো ব্যাকরণের আসল কাজ। এই সব ভাবতে ভাবতে বাবাই হঠাৎ অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করে বসে—কিন্তু দাদু, মানুষ শব্দগুলো তৈরি করল কেমন করে? যেমন ধর, বনের নাম যে 'বন', ঝর্ণার নাম যে 'ঝর্ণা', শাবলের নাম যে 'শাবল', এই সব শব্দগুলো শিখল কেমন করে?

একটু ভেবে দাদু বলল—প্রশ্নটা বড়ই কঠিন দাদুভাই। বিজ্ঞানীরা এখনো সবাই এক মত হয়ে এর উত্তর দিতে পারেন নি। তবে অনেকে বলেন অনুকার শব্দ থেকেই বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

—অনুকার শব্দ আবার কি? টিঙ্কুর প্রশ্ন।

—অনুকার শব্দ হল যা দেখছি বা শুনছি তার শব্দকে হুবহু নকল করা। যেমন ধর ছোট্ট বাচ্চারা 'কুকুর' বলতে পারে না, বলে 'ঘেউ-

ঘেউ', মানে কুকুরের ডাকের নকল করে। তেমনি গরুকে বলে 'হাম্বা'। এই রকম আর কি। মানুষও যে এক সময় প্রকৃতির সব শব্দকে নিজের মুখে নকল করত তাতে সন্দেহ নেই, কারণ এখনো আমাদের আধুনিক ভাষায় এমন শত শত শব্দ রয়ে গেছে—যেমন আমরা বলি—ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ে, দুমদাম করে পটকা ফাটে, শন শন করে হাওয়া বয়, ডিম ডিম করে মাদল বাজে আরো কত কি। এমনি ঝনঝন, পিনপিন, ঝিকমিক, খনখন, শাঁ-শাঁ, কল কল ইত্যাদি হাজার হাজার অনুকার শব্দ ব্যবহার করি আমরা। এ গুলোই হল ভাষায় আদিমতম শব্দ। হয়তো এমন হতে পারে যে, ঝরঝর করে ঝরে বলেই ঝর্ণার নাম একদিন 'ঝর্ণা' হয়ে গেছে।

বাবাই ভাবে কিছুই তা হলে ফেলনা নয়। এতদিন ছোটদের মুখে 'হাম্বা' কিংবা 'ঘেউ-ঘেউ' শুনে নেহাতই ছোটদের ব্যাপার বলেই মনে হত তার শব্দগুলোকে। এখন যেন তার কাছে নিজেদের মাথার মধ্যেকার অতি তুচ্ছ ঝিম ঝিম, ফট ফট, কটাস কটাস এমনি সব শব্দগুলোও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ওর গা যেন সির-সির করে ওঠে এ সব ভাবতে গিয়ে। সে আবার ভাবল 'সির সির' কথাটাও তো অনুকার শব্দ। নাঃ বাবাই আর ভাবতে পারে না। সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। ও যেন শুনতে পাচ্ছে গাছ মাঠ কাঠ আকাশ মেঘ পশু সবাই মিলে নিজের নিজের ভাষায় চিৎকার করছে; কেউ নীরবে আবার কেউ সরবে। বাবাই যেন দেখতে পাচ্ছে—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আকাশ বাতাস সবই ভাষা নামক এক অদৃশ্য অথচ আশ্চর্য ফাঁদের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। মানুষের কী অসীম শক্তি! শুধু ভাষা দিয়ে সে কেমন করে জানা-অজানা সব কিছুকে বেঁধে ফেলেছে! লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বোনা হয়েছে এই ফাঁদের সুতো। সত্যি ভাবাই যায় না!

টিঙ্কুর মুখেও আর কথা নেই। সেও নিশ্চয়ই ভাবছে বাবাইয়ের মতই। ভাষাই যে সভ্য মানুষের প্রাণ, ভাষা ছাড়া সভ্য মানুষের যে কোনো অস্তিত্বই নেই, সভ্যতা যে এক রকম ভাষারই দান তা কি এতদিন জানত টিঙ্কু!

ওদের নীরব ভাবনা দেখে একটু হেসে দাদু বলে—অত ভাবছিস কি দাদুরা? আরো বড় হ, দেখবি ভেবে ভেবে আর কুল-কিনারা করতে পারবি না।

অন্ধকার মাঠের উপর দিয়ে দাদুর সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মত পা বাড়ায় টিঙ্কু আর বাবাই। ভাষার কথা শুনে এখন আর ওদের নিজেদের মুখেই ভাষা নেই। আকাশে সদ্য ফোটা তারাগুলো চিন্তিত দুই কিশোরকে দেখে মিট মিট করে হাসছে তাদের নিজেদের আলোর ভাষায়।

কী দারুণ ঝক্কি

পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে দাদুর ঘরে ঢুকল বাবাই। সকাল আটটা কি নটা হবে। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে বাবাই বুঝতে পারল দাদু ঘুমচ্ছে না। আস্তে আস্তে প্রায় ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল—তুমি কেমন আছ দাদু?

—আর কেমন আছি! বেশ ভালই তো আছি এখন। আর কি এবার তো আমার আস্তে আস্তে সিন্দুকে যাবার সময় হল দাদুভাই!

অসুস্থ দাদুর কথা শুনে হঠাৎ দু চোখ কেমন ঝাপসা হয়ে গেল বাবাইয়ের। বেশ কিছুক্ষণ সে কোনো কথাই বলতে পারল না। ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বাবাই শুনেছে দাদু চল্লিশ বছর ইসকুলে মাস্টারি করেছে। কিন্তু শরীর খারাপের জন্য কোনোদিন ছুটি নেয়নি। বাবাইও তার জীবনে এই প্রথম দাদুর অসুখ করতে দেখল। রক্তের চাপ বেড়ে গেছে খুব। হৃদপিণ্ডও নাকি কি সব অসুবিধে হচ্ছে। বাবাইয়ের মা আর বাবা সারাদিন ডাক্তার ওষুধ পত্তর নিয়ে দাদুর জন্য খুব ব্যস্ত। বেশ কয়েকদিন পর আজই দাদুকে একটু সুস্থ দেখে তাঁরা যার যার ইস্কুল কলেজ যাবেন ঠিক করেছেন।

বাবাই মাকে বলে কয়ে অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছে যে সে আজকে ইস্কুল যাবে না। তবে একটা সর্ত আছে। সর্তটা এই যে, সে দাদুর ঘরে বসে মনে মনে বই পড়বে। কিন্তু দাদুর সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। বাবাই তাতেই রাজি। দুপুরে বাড়িতে থাকবে শুধু বাবাই, দাদু আর পিসি। বাবাইয়ের বিধবা পিসি কোন্নগরে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে থাকেন। দাদুর অসুখ শুনে এখানে এসে কিছুদিন আছেন।

ভর দুপুর। বাবাই শুনতে পেল অনেক দূরে কে যেন 'আ-তু' বলে কুকুরকে ডাকল। পিসি মার ঘরের মেঝেতে আঁচল পেতে শুয়েছেন। বাবাই এবার আস্তে আস্তে মার দেওয়া বইখানা নিয়ে দাদুর ঘরে ঢুকল। দাদু ঘুমচ্ছে। সে পাশে বসে বই পড়তে লাগল।

কতক্ষণ কেটে গেছে কি জানি। দাদু চোখ মেলে তাকাল কিন্তু বাবাইয়ের সেদিকে খেয়াল নেই। দাদু দেখল বই পড়তে পড়তে নাতির চোখ থেকে গাল বেয়ে জল পড়ছে। আস্তে আস্তে বলল—আমার দাদুর চোখে জল কেন?

দাদুর গলা শুনে চমকে উঠে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলল বাবাই। তারপর ধরা গলায় বলল—তোমার ঘুম ভেঙে গেছে দাদু?

—হ্যাঁরে, আর ঘুমব না। ওটা কি বই পড়ছিস?

—টম কাকার কুটির। মা তোমার সঙ্গে কথা বলতে বারণ করেছে, তুমি শুয়ে থাক আমি মার ঘরে যাই।

—তুই চুপ করে বস তো ওখানে। তোর মা বাবার আবার বেশি বাড়াবাড়ি। আমি তো খুব ভালই আছি এখন। একটু বিরক্ত হয়ে বলল দাদু।

বাবাই দাদুর কাছে থাকার লোভ সামলাতে পারল না। সে বসে পড়ে দাদুর দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ফিক করে একটু হেসে ফেলেই বইতে মন দিল। মার কড়া নিষেধের ফলে বাবাই বিশেষ কথা বলবে না দাদু সেটা জানে। কিন্তু নাতির মনের মধ্যে ধীরে ধীরে কেমন করে ঢুকে পড়তে হয় দাদু সেটাও জানে। তাই

নিজের মনেই একবার বলল—টমকাকার কুটির তো খুব ভাল বই। তা বই পড়েই চোখে অত জল এসে গেল দাদুভাই!

—এটা একটা ক্রীতদাসের গল্প তা জান? ওদের দুঃখটা বুঝলে তোমারও চোখে জল আসত। নিজের মনেই যেন বলে বাবাই বইয়ের থেকে মুখ না তুলেই।

দাদু বুঝল বরফ গলছে। তাই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার একটা কথা ছুঁড়ে দিল—এক সময় তো ক্রীতদাস বলে কিছু ছিল না। কত কাণ্ডের পর ঐ ক্রীতদাস সৃষ্টি হয়েছিল!

তাই তো, ক্রীতদাস কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা তো বাবাই জানে না। কিন্তু কোন লজ্জায় দাদুকে সে কথা জিজ্ঞেস করে এখন? ওর যে দাদুর সঙ্গে কথা বলা বারণ।

দাদু বুঝতে পারে নাতি আর বেশিক্ষণ ওর গম্ভীর ভাবখানা ধরে রাখতে পারবে না। ভেঙে পড়ল বলে। ধীরে ধীরে শুরু করল দাদু—সে আজ থেকে আট-দশ হাজার কিংবা তারও কিছু বেশি বছর আগেকার কথা। তখন মানুষ ছিল পশুর মতই বন্য। সকলকেই তখন দিন রাত পরিশ্রম করতে হত একটু খাবার জোগাড় করবার জন্যে। তারা তখন শুধু ফলমূল কুড়িয়ে খেত। কোনো খাবার নিজেরা তৈরি করতে পারত না। সে যে কী দুঃখের দিন ছিল!—দাদু যেন সেই দিনগুলোকে দেখতে পাচ্ছে—এই সময় তারা শুধু নিজেদের মধ্যে একটু আধটু কথাবার্তা চালাবার মতন ভাষা সৃষ্টি করতে পেরেছে। তারপর আবার বহু বছর কেটে গেল। মানুষের এবার একটু উন্নতি হল। নদী থেকে মাছ ধরতে শিখল। এখন তারা নদীর ধারে ধারেই বাস করতে শুরু করল। সব থেকে বড় জিনিস যেটা শিখল সেটা হল—আগুন জ্বালানো। পাথরগুলোকে ঘষে এখন বেশ মসৃণ অস্ত্রও তৈরি করতে শিখল তারা।

—বুঝেছি। আমাদের ইতিহাস বইতে এই যুগকেই বলা হয়েছে নতুন প্রস্তর যুগ। এর আগে পাথরের অস্ত্রগুলো অত মসৃণ ছিল না। সেটা ছিল পুরাতন প্রস্তর যুগ।

এক দমে এতগুলো কথা বলে ফেলল বাবাই। বলে ফেলেই সে যেন একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল, কারণ সে তো আর এখন সেই সাত-আট বছরের বাচ্চাটি নেই, বেশ বড় হয়েছে, তাই লজ্জা তো পাবেই। লজ্জা পেয়ে সে ভাবল তার তো এখন দাদুর সঙ্গে কথা বলার কথা নয়।

একটু হেসে দাদু বলল—ঠিকই বলেছিস। মানুষের সেই বন্য যুগের এটা হল দ্বিতীয় অবস্থা। বন্য যুগের শেষ মানে তৃতীয় অবস্থায় মানুষ তীর ধনুক আবিষ্কার করে ফেলল। এখন সে অনেক বেশি শিকার পেতে লাগল। খাওয়ার কষ্টটাও একটু কমল। কাঠ দিয়ে ঘর বানাতে শিখল, নৌকো তৈরি করতে শিখল, আর ছোট ছোট গ্রাম তৈরি করে এক সঙ্গে বাস করতে শিখল।

দাদু আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখল বাবাই বই বন্ধ করে ফেলেছে। সে দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে গল্প গিলছে। দাদু বুঝল বাবাইয়ের আর এখান থেকে উঠে যাবার উপায় নেই। তাই কথা বলতে আর ভালো লাগছে না এমন ভাব করে চুপ করে রইল! বাবাইও দাদুকে কথা বলাবার ওষুধ ভালই জানে। সে বলল—নাঃ উঠে যাই বাবা। মা আবার তোমার সঙ্গে কথা কইতে বারণ করে গেছে।

বাবাইকে উঠে পড়তে দেখে লক্ষ্মীছেলের মতো দাদু আবার বলতে শুরু করে—বন্য যুগের তিন অবস্থা শেষ হবার পর, যেদিন মানুষ মাটির বাসনপত্তর বানাতে শিখল সেদিন থেকেই শুরু হল তার বর্বর যুগ। বর্বর যুগ, বোঝাই যাচ্ছে বন্য যুগের থেকে অনেক ভালো অবস্থা। দাদু চোখ বুজে যেন স্বপ্ন দেখে চলেছে—বর্বর যুগেরও তিনটে অবস্থা আছে। এই যুগের প্রথম দিকেই মানুষ পশুপালন করতে শিখেছে। আর দ্বিতীয় যুগে নদী থেকে জল সেচ করে লাউ কুমড়ো জাতীয় নানা ধরনের তরিতরকারি ফলাতে পারল। পাথর দিয়ে ঘরও বানাতে শিখে ফেলেছে এখন।

—আমাদের দেশে বর্বররা কোথায় থাকত ? অসতর্ক বাবাইয়ের জিজ্ঞাসা।

—আমরা যে আর্য জাতির কথা শুনি তারাই তো বর্বর যুগের লোক। দাদু বলে।

দাদুর কথায় অবাক হয়ে বাবাই বলে—যারা অত বেদ, উপনিষদ এই সব সৃষ্টি করল তারা বর্বর হবে কেমন করে ?

দাদু হাসল। আসলে জানিস তো দাদুভাই, বর্বর কিন্তু কাউকে গালাগালি করার জন্যে বলা হয় নি। মানুষের বুঝবার সুবিধের জন্যে সভ্যতার এক একটা অবস্থার এক একটা নাম দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বর্বর যুগের মানুষ মানে কিন্তু তারা ছোট ছিল না। সেই যুগের মানুষের পরিশ্রমের ফলেই তো আজ মানুষ চাঁদে পৌঁছতে পারছে। না হলে এখনকার মানুষকে তো আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হত। দাদু বুঝিয়ে বলে।

ব্যাপারটা বাবাইয়ের কাছে বেশ খোলসা হয়ে গেল। দাদু না থেমেই বলে চলেছে—দ্বিতীয় অবস্থা শেষ হতেই শুরু হল বর্বরদের সব থেকে উন্নত অবস্থা। এই সময় মানুষের জীবনে নানা ধরনের ব্যাপার ঘটে গেল। সে এখন লোহা আবিষ্কার করেছে। লোহা দিয়ে নানা রকম জিনিস তৈরি করতে পারছে। এটা যে কত বড় উন্নতি তা কিন্তু আজকের যুগে দাঁড়িয়ে বোঝা খুব মুস্কিল। লোহা ব্যবহার করতেই অস্ত্রের উন্নতি হল, তাই তাদের শক্তিও বেড়ে গেল খুব। আর একটা কাজ যা শিখল না মানুষ সে আর কি বলব !

—কি কাজ দাদু ?

—মানুষ এখন হরফ সাজিয়ে লিখতে শিখল। তার মানে এখন মানুষ লোহার লাঙল দিয়ে চাষ করে, বন কেটে ঘর বাড়ি তৈরি করে, মানে একেবারে রীতিমত ভদ্দরলোক হয়ে উঠল। আর এই যুগেই মহা মহা কবিরা সৃষ্টি করলেন বিরাট বিরাট মহাকাব্য।

—মহাকাব্য সৃষ্টি করে ফেলল ! অবাক হয়ে যায় বাবাই।

—হ্যাঁ রে, এই যে রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, অডিসি সব ঐ বর্বর যুগের শেষ অবস্থার সৃষ্টি।

—আমরা এখন বর্বর যুগে থাকলে ভাল হত। একটা ছোট্ট দেখে মহাভারত লিখতাম তা হলে, অত বড় মহাভারত পড়া যায়?

দাদু আর নাতি দু জনেই হেসে ওঠে। পাশের টেবিলে রাখা কাচের গেলাস থেকে একটু জল খায় দাদু। তারপর বলে—এই যুগেই সৃষ্টি হয়েছিল ক্রীতদাস।

কথাটা শুনে বাবাই যেন আকাশ থেকে ধপাস করে মাটিতে পড়ল। যারা এত উন্নতি করল, মহাকাব্য লিখল, শেষে তারাই কি না অমন একটা খারাপ জিনিস সৃষ্টি করল। মনের এই ভাবটা প্রকাশই করে ফেলল দাদুর কাছে। দাদু হেসে বলে—খারাপ কেন হবে দাদুভাই? খারাপ তো আজ মনে হচ্ছে। কিন্তু সেদিনকার সমাজে এর ভীষণ প্রয়োজন ছিল। এই দেখ না আজ আমরা যেটাকে খুব ভাল মনে করছি, এখন থেকে হাজার বছর পরে সেটাই হয়তো কত খারাপ মনে হবে। আসলে কি হয়েছিল জানিস? মানুষ তখন চাষ করতে শিখেছে। কিন্তু চাষ করতে তো অনেক লোক ছিল না তখন। তাই যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের যে সব লোককে তারা বন্দী করত, এতদিন তাদের মেরে ফেলত, কিন্তু এখন থেকে বর্বররা বন্দী করা শত্রুদের মেরে না ফেলে গরু মোষের মতন পুষতে শুরু করল। আর তাদের দিয়ে চাষের কাজ কিংবা অন্যান্য কাজও করিয়ে নিতে লাগল। প্রচুর ফসল হতে লাগল তখন। বিরাট বিরাট পিরামিড তৈরি হল এই যুগে। পৃথিবীর মস্ত মস্ত সব আশ্চর্য জিনিস যা কিছু আছে তার বেশির ভাগই সৃষ্টি হয়েছে এই ক্রীতদাসদের দ্বারাই। একটু থেমে দাদু আবার বলে—সেই ক্রীতদাস সৃষ্টি হয়েছিল বলেই না আজ টমকাকার কুটির পড়ে ভর দুপুর বেলায় চোখের জল ফেলতে পারছিস!

বাবাই চুপ করে আছে। সে যেন মনে মনে মানুষের এই আট-দশ হাজার বছরের গল্পটাকে হজম করে নিতে চাইছে। অনেক দূরে

কোথায় একটা পাখি গুর্ র্‌-র –ঘুর্‌-র্‌-র্ করে ডেকে চলেছে। তাতে দুপুরটাকে আরো নির্জন আর নিশুতি মনে হচ্ছে। বাবাই যেন মনে মনে মিশরের পিরামিড, ব্যাবিলনের ঝুলানো উদ্যান, চীনের প্রাচীর—ক্রীতদাসদের কীর্তিগুলো সব দেখতে পাচ্ছে। কেন জানি না বাবাই হঠাৎ চমকে উঠে দাদুকে একবার জড়িয়ে ধরল। কি হল রে দাদু! দাদুর উদ্বেগ। একটু পরেই ভয় পেয়েছিল বলে বাবাই লজ্জা পেল। আসলে কখন যেন পাশের ঘর থেকে বিধবা পিসি এসে দাঁড়িয়েছেন। পরনে তাঁর ধবধবে সাদা থান আর এলো করা রয়েছে ঝক ঝকে সাদ চুল। অন্যমনস্ক বাবাইয়ের হঠাৎ মনে হয়েছিল পিরামিড বা ঝুলানো উদ্যান থেকে বুঝি বর্বর যুগের কোনো আদিম মানুষ উঠে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে তাদের দরজায়।

—দাদুর সঙ্গে বেশি কথা বল না কিন্তু। বাবাইয়ের প্রতি পিসির সাবধানবাণী।

—না না ও তো কোনো কথা বলছে না, চুপ করে বসে আছে। দাদু উত্তর দিল। পিসি চলে গেল বাবাইয়ের গাল টিপে একটু আদর করে দিয়ে।

পিসির কথায় আবার মনে পড়ল দাদুর সঙ্গে কথা বলা বারণ। কিন্তু এখন আর বাবাই সামলাতে পারে না নিজেকে। সে বলে—মানুষের বন্য অবস্থা, আর বর্বর অবস্থা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু মানুষ সভ্য হল কেমন করে?

—ব্যক্তিগত সম্পত্তি যত বেশি করে সৃষ্টি হতে শুরু করল মানুষ তত বেশি করে আজকের সভ্যতার দিকে এগোতে লাগল।

—ব্যক্তিগত সম্পত্তি আবার কি? বাবাইয়ের প্রশ্ন।

—যেমন ধর যে জামাটা তুমি পরে আছ, কিংবা তোমার বইগুলো, অথবা তোমার ছবি আঁকার রঙ তুলি—এ সব তো আর টিঙ্কু বা ঝুলন বা বুম্বা ওরা কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। তুমি ওদের দেবেও না। দেবে কি তুমি? দাদু জিজ্ঞাসা করে।

—কেন দেব? ওগুলো তো আমার।

—সুতরাং ওগুলো তোমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

—ওরা আমার জিনিস নেবেই বা কেন? জামা বই রঙ তুলিতো ওদেরো সবার আছে। বলে বাবাই।

—সেগুলো হল ওদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। উত্তর দেয় দাদু।

বাবাই কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না। সে অবাক হয়ে বলে—জমি বাড়ি বাগান গাড়িঘোড়া দোকানপাট সব কিছুই তো কারো না কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

—আমিও তো তাই বলছি দাদুভাই। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি যখন সৃষ্টি হয়েছে মানুষ তখন থেকেই আস্তে আস্তে আজকের সভ্যতার দিকে এগিয়েছে।

—তার মানে কি এক সময় ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না?

—ছিলই না তো।

একটু সময় ভেবে নিয়ে নিচের পাটির দাঁতটা একবার সামনে ঠেলে এবং আবার ঢুকিয়ে দাদু বলে—সেই আদিম কালে মানুষ দল বেঁধে বাস করত। এক এক দলে থাকত অনেক মানুষ। তারা যে জায়গায় থাকত সেই জায়গাটা ছিল তাদের সকলের, কারোর একার নয়। গরু বাছুর যা কিছু পুষত কিংবা লাঙল নিড়ানি যা কিছু ব্যবহার করত সে সবও ছিল দলের সকলের; কারো একার নয়। আবার যে শিকার তারা পেত, কিংবা যা কিছু ফসল হত তাতেও ছিল সকলের সমান সমান ভাগ। যখন খেতে পেত না তখন সবাই সমান ভাবে উপোস করত।

বাবাই অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—তা হলে এই মানুষদের চালাত কে?

—কেন নিজেরাই নিজেদের চালাত। সমাজে তখন দু জন নেতা থাকত। একজন হল যুদ্ধের সময়কার নেতা। সমাজের সব মানুষ তার কথা মেনে যুদ্ধ করত শত্রুর সঙ্গে। আর যখন যুদ্ধ চলত না, অর্থাৎ শান্তির সময়ে থাকত আর একজন নেতা। সমাজের চাষ বাস, ন্যায়অন্যায়ের বিচার এই সব কাজে তার কথা মানত সবাই। সেই

নেতা আবার সামাজের অন্য সব মানুষের যুক্তিপরামর্শও শুনত।

—দেশে তখন তা হলে পুলিশ সৈন্য আদালত কিছু ছিল না? বাবাইয়ের বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

—ওসব কিছু ছিল না তখন। সৈন্যরা তো যুদ্ধ করে। কিন্তু তখন আলাদা কোনো সৈন্য টৈন্য ছিল না। যুদ্ধের সময় সবাই যুদ্ধ করত। পুলিশের কাজ কোথাও অশান্তি না হয় তাই দেখা। সেই শান্তিরক্ষার কাজটাও তখন তারা নিজেরাই করত। কোথাও কোনো আশান্তি হলে তারা তাদের নেতার কাছে জানাত। তারপর সবাই মিলে বসে বিচার করত ব্যস। তা হলে আর আদালতেরই বা প্রয়োজন কি? আদালত তো বিচার করে। আসলে কি জানিস দাদুভাই,—দাঁতটা একটু এগিয়ে নিয়ে বলে দাদু—ব্যক্তিগত সম্পত্তি যখন সৃষ্টি হল, তখন প্রয়োজন হল একে যাতে অন্যের সম্পত্তি কেড়ে না নিতে পারে তার ব্যবস্থা করা। তাই তখন সৃষ্টি হল পুলিশ সৈন্য আদালত এই সব নানা রকম জিনিস। দাদু থামল।

বাবাইয়ের মাথার মধ্যে সব যেন কেমন উল্টে-পাল্টে যেতে থাকল। জগৎটা সত্যিই বড় অদ্ভুত জায়গা। এখানে কিসের থেকে যে কী হয়ে বসে আছে বোঝাই মুস্কিল। সে ভাবল ব্যক্তিগত সম্পত্তি তৈরি করে এত পুলিশ-সৈন্য-কোর্ট-কাছারি সৃষ্টি করার কি দরকার ছিল? সে বেশ একটু বিরক্ত হয়েই প্রশ্ন করে—তা প্রথম যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি তৈরি হল তখন সেটা কার সম্পত্তি হল?

কি এক কাজে পিসি একবার ঘরে ঢুকতেই দাদু ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। বাবাই কোনোমতে হাসি চেপে টমকাকার কুটির খানার মধ্যে মনোযোগী হল। পিসি চলে যেতেই দাদু আবার শুরু করে—ঠিক কবে কী ভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টি হয়েছিল পণ্ডিতরা সঠিক ভাবে বলতে পারেন না। তবে যেদিন থেকে মানুষ নিজে ফসল উৎপাদন করতে শুরু করল, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্ভাবনা সেদিন থেকেই দেখা দিয়েছিল।

—কেন ফসলের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ?

—আগে মানুষ শিকার টিকার করে যে খাবার পেত তাতে নিজেদের ভাল করে পেট চলাই মুস্কিল ছিল। কিন্তু যখন ফসল উৎপাদন করতে শিখল তখন অনেক অনেক বেশি খাবার জোগাড় হল। মানুষ পেট ভরে খাবার পরও অনেক ফসল বাঁচল। ঐ যে বেঁচে যাওয়া ফসল, সেটা নিয়েই হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির শুরু। আর একটা পরিবারের যা কিছু সম্পত্তি তার সব কিছুর মালিক হল সেই পরিবারের যে কর্তা সে।

—এর মধ্যে আবার পরিবার এল কোথা থেকে ?

—কেন একটা লোক তার বৌ আর তার ছেলে মেয়ে নিয়েই হয় একটা পরিবার।—দাদু বুঝিয়ে বলে। আবার বলে—তবে হ্যাঁ, এই বিয়ে ব্যাপারটারও বিরাট সব গোলমেলে ইতিহাস আছে। সে সব বড় হলে জানতে পারবে।

—কেন এখনই একটু বল না। গোলমালটা কিসের ? বিয়ে মানে তো মাছ মাংস দৈ মিষ্টির ভোজ। সে তো বেশ ভালই ব্যাপার।

দাদু একটু হেসে সংক্ষেপে বলে—এক সময় সমাজের সব মেয়েই সব ছেলের বৌ ছিল। তারপর দিন যত যেতে লাগল ততই বিয়ের চেহারাটাও পাল্টাতে লাগল। একসময় ঠিক হল মানুষের একটা দলের সব ছেলেরা অন্য দলের সব মেয়েদের বর হবে। কিন্তু এক দলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ে হবে না। আবার একটা সময়ে একটা মেয়ের আবার অনেক বর থাকত, যেমন ধর—দ্রৌপদীর ছিল পাঁচ পাঁচটা বর। সেই সময় বাচ্চাদের একটা মা থাকত কিন্তু বাবা থাকত অনেকগুলো।

বাবাইয়ের চোখে আর পলক পড়ছে না। একি সব তাজ্জব ব্যাপার রে বাবা !

—যতদিন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল ততদিন এই সব ধরনের বিয়েতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না। বলে দাদু।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ অবার কি ? কোনোমতে বলে বাবাই।

—যে সমাজে মা-ই প্রধান, আর মার পরিচয়েই সবার পরিচয় হয় তাকে বলে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। এই দেখ না, এখন চলছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। কেউ তোমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তুমি তোমার বাবার নাম বলবে। আরো লক্ষ কর তোমার বাবার পদবীটাই হল তোমার পদবী। কিন্তু মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরাই ছিল প্রধান।

—মেয়েরা তখন ছেলেদের মত খাটত ?

—নিশ্চয়ই। ছেলেরা শিকার করত বনে বনে। আর মেয়েরা বাচ্চাদের মানুষ করত, ফল কুড়াতো, এমন কি চাষও করত। চাষ শুধু করত না, পণ্ডিতরা বলেন চাষ করে ফসল ফলানোর ব্যাপারটা মেয়েদেরই আবিষ্কার। বাবাইকে হাঁ করিয়ে দিয়ে বলে দাদু।

চুপ করে গেছে বাবাই। পুরো অবস্থাটা নিজের মনে একটু ভেবে নেবার চেষ্টা করছে। বেশ একটু পরে সে জিজ্ঞেস করে—তাহলে মেয়েদের হাত থেকে ছেলেদের হাতে সব চলে গেল কি করে ?

—সেটাই তো কথা। চাষ আবাদের কাজ যখন খুব বেশি বেড়ে গেল তখন বড় বড় জঙ্গল কেটে বিরাট বিরাট জমির দরকার হল। শুধু কি তাই ? প্রচুর পরিমাণে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি দরকার হল। মেয়েরা বাচ্চাদের সামলে, ঘরের কাজ করে আর অত চাষের কাজ, জঙ্গল কাটার কাজ, যন্ত্র তৈরির কাজ করে উঠতে পারল না। ঐ সব খুব দরকারি কাজগুলো তখন শুধু ছেলেদের হাতে চলে গেল, আর মেয়েরা শুধু ঘরে বসে বাচ্চা সামলাতে লাগল, আর রান্নাবান্না করতে লাগল। ব্যস চাষের উপরই যখন সমাজ দাঁড়িয়ে আছে, আর চাষের মালিক যেহেতু ছেলেরা, তাই ছেলেরাই সমাজে প্রধান হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ শেষ হয়ে গিয়ে শুরু হয়ে গেল পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষ-প্রধান সমাজ।

একসঙ্গে এত কথা বলে দাদু হাঁপিয়ে গেছে। হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল—যেমনি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তৈরি হল অমনি বিয়ের কায়দাটাও গেল পাল্টে।

—কেন এর সঙ্গে আবার বিয়ের কথা আসছে কোত্থেকে ?

—আসবে না ? আগেই বলেছি যত বেশি ফসল হতে লাগল মানুষের খেয়ে পরেও অনেক কিছু বেঁচে যেতে লাগল। আর ছেলেরাই এখন যেহেতু সমাজে প্রধান তাই ছেলেরাই হল ঐ বেশি হয়ে যাওয়া সব কিছুর মালিক। কিন্তু তখন একটা কঠিন প্রশ্ন দেখা দিল। একটা লোক মরে গেলে তার জিনিসপত্তরগুলোকে, মানে সম্পত্তিটা ভোগ করবে কে ?

—কেন তার ছেলেমেয়েরা ! চটপট উত্তর দেয় বাবাই।

—ঐ ছেলেমেয়ে নিয়েই তো হল মুস্কিল। মা না হয় বুঝল কোন ছেলেমেয়েগুলো তার, কারণ তারা তার গর্ভেই জন্মেছে। কিন্তু বাবা বুঝবে কেমন করে যে কোন ছেলেমেয়েগুলো ঠিক তার ? কারণ আগেই বলেছি তখনকার মেয়েদের অনেকগুলো করে বর থাকত বলেই ছেলেমেয়েদের বাবাও ছিল অনেক। তাই একজন বাবা দাবি করতে পারত না যে অমুক ছেলেটা বা মেয়েটা তার একার। তাই তখন বিয়ের নিয়মটাও গেল উল্টেপাল্টে।

—বাব্বাঃ, নেমন্তন্ন খাবারও তো তখন অনেক ঝক্কি ছিল দেখছি। দুঃখ প্রকাশ করে বাবাই।

একটু হেসে দাদু বলে—তখন থেকে ঠিক হল সব মেয়েই মাত্র একজন ছেলেকেই বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু ছেলেরা ইচ্ছে করলে অনেক মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। সেই জন্যেই দেখিস না দশরথের তিন রানী ? তারপর রূপকথায় আছে এক রাজার সাত রানী। এই রকম বিয়ে চালু হবার পর সৃষ্টি হল পরিবার। একটা লোক, তার বৌরা আর ছেলেমেয়েরা মিলে হল তার পরিবার। আর পরিবারের কর্তা যেহেতু সেই লোকটা, তাই সেই পরিবারের জমি, গরু, ফসল, যন্ত্রপাতি, বাড়িঘর সব কিছুর মালিকও হল সে। এই পরিবারে যেহেতু আর কোনো বর নেই তাই সেই লোকটা এখন একাই বাবা। ছেলেমেয়েগুলোও শুধু তারই। সে মরলে তাই এখন ঐ ছেলেমেয়েরাই পাবে তার সম্পত্তি।

একটু থেমে দাদু বলে—তা হলে এখন বুঝতে পারলি তো কেমন করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর পরিবার তৈরি হল ?

—হ্যাঁ দাদুভাই বুঝেছি। আর ঐ ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টি হয়েছে বলেই থানা পুলিশ সৈন্য আদালত সরকার এই সব সৃষ্টি হয়েছে, এই তো ?

সত্যিই বাবাই দাদুর সব কথা বুঝতে পেরেছে এখন। দাদু বলে—হ্যাঁরে দাদু, ওসব না হলে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সব রক্ষা করবে কে ? অশান্তি থামাবে কে ? আর থানা পুলিশ আদালত সৈন্য সরকার এসব নিয়েই তো এক একটা দেশ—এক একটা রাষ্ট্র। এই দেশ এই রাষ্ট্র—এই তো হল বর্তমানের সভ্য যুগ। দাদু হাসতে থাকে।

—কত অসভ্যতার পর যে মানুষ সভ্য হয়েছে তার ঠিক নেই, তাই না দাদু ? সত্যি কী দারুণ ঝক্কিরে বাবা! বলে বাবাই।

দাদু নাতিকে কাছে টেনে নিয়ে উদাস ভাবে বলে—মানুষ এখনো আরো বেশি সভ্য—সত্যিকারের সভ্য হবার চেষ্টা করছে। দাদুভাই সে সব আমি দেখে যেতে পারব না—সে সব দেখবি তোরা। দেখবি একদিন সারা পৃথিবী জুড়ে একটাই মাত্তর স্বপ্নের দেশ তৈরি হবে—সত্যিকারের সভ্য দেশ।

কতক্ষণ কেটে গেছে কে জানে। বাবাইয়ের মা ইসকুল থেকে ফিরে এসে দাদুর ঘরে ঢুকে দেখেন দাদু আর নাতি গলা জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে—গভীর ঘুম। আর পাশেই পড়ে আছে টমকাকার কুটির।

ঘুমের কল

বাবাইয়ের পড়াশুনোর ব্যাপারটা এতদিন দাদুই দেখত। দাদু অসুস্থ হয়ে পড়ার পর বাবাইয়ের বাবা এখন পড়ান ওকে। বাবার কাছে পড়াটা ওর মোটেই পছন্দ নয়। দাদুর কাছে পড়ার যে মজা বাবাই তা বাবার কাছে পায় না। কিন্তু কি আর করা যাবে ? উপায় তো নেই।

ইতিহাস পড়া হচ্ছিল। বুদ্ধদেবের বৌদ্ধধর্ম আর মহাবীরের জৈনধর্ম পড়াতে গিয়েই সেই ঘটনাটা ঘটিয়ে ফেললেন বাবাইয়ের বাবা। বিকেল বেলায় খেলাধূলোর পর সন্ধেবেলায় ধর্মের কথা শুনতে শুনতে ঘুমে ঢুলছিল বাবাই। ওর ঘুম ছুটে গিয়ে চোখে জল এসে গেল তখন যখন বাবার বেশ একটা ওজনদার চড় এসে পড়ল তার গালে। কান্না শুনতে পেয়ে পাশের ঘর থেকে ছুটে এল দাদু। একটু সময় ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গম্ভীর হয়ে থাকার পরই বাবার উপর দাদুর রাগ যেন আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়ল।

—লেখা পড়া শিখলেই পড়ানো যায় না বুঝলে? দাদু বলে বাবাকে।

—আমি পড়াচ্ছি, সে দিকে মন না দিয়ে ঘুমে ঢুলছে! এই কি পড়ার নমুনা! বাবা জবাব দেবার চেষ্টা করেন।

—সে দোষ তোমার। বুদ্ধ আর মহাবীরকে এমন লোভনীয় করে তুলতে পার নি তুমি যাতে ওর ঘুম ছুটে যায়।

এমনি ধারা আরো কত কথা যে দাদু বাবাকে বলল তার সব মানে বাবাই বুঝতেও পারল না। শুধু দেখল দাদুর বকুনি খেয়ে বাবা একদম চুপ মেরে গেছেন। বাবার কথা ভেবে বেশ একটু কষ্টও হচ্ছিল বাবাইয়ের, আবার অবাক হচ্ছিল এই ভেবে যে, দাদুর মুখের উপর বাবা একটাও কথা বললেন না। মাথা নিচু করে রইলেন। কতক্ষণ ধরে বকুনি চলেছিল কে জানে! বাবাইয়ের কান্নাটান্না তখন মাথায় উঠে গেছে। এক সময় দাদু বাবাইয়ের হাতে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে বলল—চল তো দাদুভাই, আজ থেকে তুই আবার আমার কাছেই পড়বি। বাবাইকে টানতে টানতে চাঁদের আলোয় ভরা সামনের বারান্দায় নিয়ে গেল দাদু। বাবাই যেন বাঁচল বোধ হয়। বাবাও বাঁচলেন। আর নাতির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে দাদুও বাঁচল কিনা কে জানে!

—খুব লেগেছে বুঝি তোর দাদুভাই? কথাটা দাদু এমনভাবে জিজ্ঞাসা করল যেন দাদুর গালেই পড়েছে মারটা।

বাবাই কিন্তু ততক্ষণে মারের কথা ভুলেই গেছে। তাই সে কথা ঘুরিয়ে বলল—বুদ্ধদেব মহাবীর এরা সব ধর্ম ধর্ম করতে গেল কেন বল তো দাদু? ওরা ও সব না করলেই তো আর আজকের ঝামেলাটা হত না!

নাতির কথা শুনেই দাদুর মুখচোখের ভাবটা একদম বদলে গেল। একটু আগেই যে এত কাণ্ড ঘটে গেছে তা যেন তার মনেই রইল না আর। ধর্মকর্ম মানুষ যে কেন করে তার সব বিচিত্র কথা আছে। বাঁচতে গেলে মানুষকে কত কিছু করতে হয়, কত কিছু জানতে হয় তার কি আর শেষ আছে?—বলে দাদু।

—কেন যারা ধর্ম মানে না, যারা অধার্মিক লোক তারা কি বাঁচে না? বলে বাবাই।

দাদু হাসল বাবাইয়ের কথায়। তারপর বলল—আজ ও সব কথা থাক, আর একদিন বলব।

—কেন দাদু আজই বল না গো। আজ আমার একদম পড়তে ভাল লাগছে না। নাতির আব্দার।

বলব না বলব না করেও কখন যেন দাদু নিজের অজান্তেই একটু একটু করে কথা শুরু করে—সে অনেক অনেক কাল আগের কথা। মানুষ তখনো ভাল করে সভ্যই হয়নি। এই প্রকৃতিতে চারদিকেই তখন তার বাধা! নদী পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে পারে না সে কিংবা ডিঙিয়ে যেতে গেলেই দেখে তাকে ডুবে মরতে হয়—পড়ে মরতে হয়। মাঝে মাঝেই দেখে বিরাট বিরাট জঙ্গলে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন, অথচ নিজেরা তখনো ভাল করে আগুন জ্বালতে পারে না। দাবানল কেন হয় যেমন সে জানে না, তেমনি আকাশ থেকে বৃষ্টি হয় কেন তাও তার অজানা। এমন সুন্দর যে নদী—যার জল সে খায়, যার তীরে ফসল হয়—সেই নদী কে সৃষ্টি করল? প্রকৃতির সব কিছু সম্পর্কেই তার জিজ্ঞাসার আর কৌতূহলের অন্ত ছিল না। প্রকৃতির সব কাজ কর্মই তার কাছে ছিল এক একটা

বিস্ময়। তাই তারা মনে করতে শুরু করল প্রকৃতির সব কিছুই আসলে জীবন্ত। ওদের সবারই প্রাণ আছে।

—নদী, পাহাড়, পাথর এ সবের আবার প্রাণ আছে নাকি? ওরা তো সব জড় বস্তু। হাসতে হাসতে বলে বাবাই।

—তখনকার মানুষ তো আর তোমার মতন বিজ্ঞান পড়ে নি। তাই তারা ওসব বিশ্বাস করত। নদী তাদের এত উপকার করে, আবার নদীর জলেই বন্যা হয়ে কত লোক মারা যায়! তারা ভাবল নদী রেগে গেলে বন্যা হয়, জঙ্গল রেগে গেলে দাবানল জ্বলে ওঠে—এমনি সব আর কি! তাই কেউ যাতে রেগে না যায়, সবাই যাতে সন্তুষ্ট থাকে তার ব্যবস্থা করতে হল তাদের।

—সে কি, ওদের আবার সন্তুষ্ট করবে কেমন করে? ওদের সব ছবির বই, রং, পেনসিল, ফুটবল—এই সব কিনে দিল নাকি। বাবাই হাসতে থাকে।

একটু হেসে দাতু কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় হঠাৎ সামনের রাস্তা থেকে একটা বাচ্চার কান্না শোনা গেল। একটা ছোট্ট ছেলে মার সঙ্গে যেতে যেতে রাস্তায় পড়ে গিয়ে কাঁদছে। রাস্তার লাইটপোস্টে আলো জ্বলছে, তাই দাতু আর বাবাই দুজনেই তাকিয়ে দেখল বাচ্চাটা রাগের চোটে রাস্তাটাকেই আচ্ছা করে লাথি মারছে। ওর মা বলছে—হ্যাঁ খুব করে মেরে দাও। বাচ্চাটা দু চার বার লাথি মেরে চোখ মুছে মার সঙ্গে চলে গেল।

দাতু বলল—দেখলি দাতুভাই, বাচ্চাটা রাস্তাটাকে জীবন্ত কোনো জিনিস ভেবেছে। মনে করেছে রাস্তাটাই ওকে ব্যথা দিয়েছে। সেই জন্যে রাস্তাটাকে লাথি মেরে ও কান্না ভুলে গেল। লক্ষ বছর আগেকার মানুষের মনটা ছিল ঐ বাচ্চাদেরই মতন। সব জিনিসকে তারা জীবন্ত ভাবত। ইংরেজিতে একে বলে এ্যানিমিজ্ম্ বা সর্বপ্রাণবাদ।

একটু থেমে বাবাই ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে অবাক হল। তারপর বলল—ওরা না হয় বিশ্বাস করত সব কিছুর প্রাণ আছে। কিন্তু

আসলে তো সব কিছুর প্রাণ নেই। তা হলে আগেকার মানুষেরা ওদের খুশি করত কেমন করে ?

—তখনকার মানুষের খাবার অভাব ছিল খুব। একটু খাবার পেলেই মানুষ ভীষণ খুশি হত। তাই তারা ভাবল নদী পাহাড় বন সমুদ্র পাথর ওরাও খাবার পেলে খুশি হবে। তাই তারা খাবার আর ফুল এনে গাছের গোড়ায় দিত। নদী সমুদ্রে ফেলত আর সবার কাছে প্রার্থনা করত যাতে তারা খুশি থাকে। দেখিস না এখানে তো ঠাকুরের সামনে কত খাবার আর ফুল দেওয়া হয়। কিন্তু ঠাকুর কি খায় ? ঠাকুর তো মাটি দিয়ে তৈরি। কিন্তু তবু মানুষ বিশ্বাস করে যে ঠাকুর ও সব খায়।

—ও বুঝতে পেরেছি—বুঝতে পেরেছি—বাবাই উল্লসিত হয়ে বলে—মানে এই ভাবেই ওরা পুজো করতে শুরু করে ছিল, তাই না দাদু ?

—ঠিক বলেছিস দাদুভাই। এমনি করেই আদিমকালে ঠাকুর-দেবতা আর ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর দিন যত যেতে লাগল ততই মানুষ আরো নানান সমস্যার মুখে পড়তে লাগল, আর সে সব থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে আবার নতুন নতুন দেব দেবী সৃষ্টি হল। যেমন বসন্ত রোগের দেবী শীতলা, ওলাওঠার দেবী ওলাইচণ্ডী, সাপের দেবী মনসা—এই রকম আরো কত কি ! ঐ দেবীরা যদি সন্তুষ্ট হন তবে আর ঐ সব রোগভোগ কিংবা বিপদ আপদ হবে না।

—কিন্তু সত্যিই কি ওদের পুজো করলে ঐ সব বিপদ হবে না ? অবাক হয়ে বাবাই জিজ্ঞেস করে।

—আরে তা নয়,—দাদু বলে—ঐ পুজো করার ফলে মানুষ বিশ্বাস করত দেবী সন্তুষ্ট হবেন, সুতরাং বিপদ আর হবে না। এই বিশ্বাসে তারা মনে জোর পেত। আসলে প্রকৃতির কোনটা কি কারণে হয় মানুষ তা তো জানত না; তাই ঐ সব ক্রিয়া কাণ্ড করে প্রকৃতিকে তারা আয়ত্তে আনার চেষ্টা করত। আয়ত্ত করার কায়দাটা তাদের ঠিক ছিল না। কিন্তু ঐ রকম চেষ্টা না করলে তারা বাঁচতেও পারত

না। ফসলের দেবতাকে পুজো করে তারা মনে করত ফসল তাদের হবেই। তাই তারা খুব পরিশ্রম করে জমি চাষ করত। আসলে ফসল হত পরিশ্রমের ফলেই, কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল দেবতার আশীর্বাদেই হয়েছে। আবার পুজো না করলে কঠিন পরিশ্রম করে ফসল ফলানোর মনের জোরও পেত না ওরা। সেই জন্যেই তো বলছিলাম দাদুভাই যে, বাঁচার জন্মেই মানুষ একদিন ধর্ম সৃষ্টি করেছিল।

বাবাই এতদিন জেনে এসেছিল দেবতারাই জগৎ সৃষ্টি করে। এখন দাদুর কাছে শুনল মানুষই দেবদেবী সৃষ্টি করেছে। সে বেশ একটু অবাক হয়। জিজ্ঞাসা করে—মানুষ একদম প্রথমে কোন দেবতাকে পুজো করত ?

—বিজ্ঞানীরা বলেন মানুষ একদম প্রথমে পুজো করত পশুকে যার যার টোটেম হিসেবে। বলে দাদু।

—টোটেম আবার কি ? বাবাইয়ের অবাক জিজ্ঞাসা।

—সেই আদিম যুগের এক এক দলের মানুষেরা মনে করত এক একটা পশু থেকেই তাদের জন্ম হয়েছে। যেমন ক্যাঙ্গারু টোটেমের লোকেরা মনে করত যে, তাদের আদি পিতা ছিল ক্যাঙ্গারু। এরা কখনো ক্যাঙ্গারু মারত না, ক্যাঙ্গারুর পুজো করত।

--ও এবার বুঝতে পেরেছি। আমরা যেমন কাশ্যপ গোত্র, আমরা যেমন মনে করি আমরা কাশ্যপ মুনির বংশধর, তেমনি আর কি তাই না দাদু ? বাবাইয়ের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে।

—বাবাইয়ের কথায় দাদুকে খুব খুশি দেখায়—তুই ঠিক বলেছিস দাদুভাই। এখন আমাদের মধ্যে যেমন কাশ্যপ গোত্র, শাণ্ডিল্য গোত্র, গোতম গোত্র, শৌনক গোত্র, তেমনি তখন মানুষেরা কেউ ভাবত তারা ক্যাঙ্গারুর বংশধর, কেউ বাইসনের বংশধর, কেউ বা অন্য জন্তুর বংশধর। টোটেম ব্যাপারটা অনেকটা এখনকার ঐ গোত্রের মতনই ব্যাপার আর কি। আর একটা জিনিস লক্ষ করেছিস দাদু ভাই ? আমাদের গোত্রগুলোর নামগুলোও কিন্তু নানা রকম জীবজন্তুর নামেই

হয়েছে। যেমন,—'কাশ্যপ' কথার অর্থ কচ্ছপ, 'ষাণ্ডিল্য' এসেছে ষণ্ড বা ষাঁড় থেকে, 'গোতম' অর্থ গরুর বাচ্চা বা বাছুর, 'শৌনক' কথা এসেছে 'শুনক' থেকে—শুনক মানে কুকুর।

দাদুর কথা শুনে বাবাই কেমন যেন হয়ে যায়। দাদু বলে যায়—আমরা যেমন বিয়ে, অন্নপ্রাশন—এই সব শুভ কাজের আগে পূর্ব-পুরুষের কথা স্মরণ করি, ঠিক তেমনি তখনকার মানুষরাও শিকারে যাবার আগে তাদের নিজের নিজের টোটেমের পুজো করত। সেই জন্যেই বলছিলাম যে, পশুর পুজো শুরু হয় সবার আগে।

—কিন্তু দাদু, লোকে বলে যে, খারাপ লোকের আত্মা মরার পরে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায় আর ভাল লোকের আত্মা স্বর্গে যায়।—এই আত্মার কথা মানুষ জানল কি করে?

দাদু দাঁতের পাটিটা একবার সামনে ঠেলে আবার ঢুকিয়ে নিয়ে বলে—আত্মাও মানুষেরই সৃষ্টি দাদুভাই। মানুষ আগে জানত না কেন লোকে ঘুমিয়ে পড়ে আর কেনই বা মরে যায়। এদিকে ঘুমের মধ্যে তারা নানা রকম স্বপ্ন দেখত, নানা রকম জিনিস দেখত স্বপ্নে। স্বপ্নের সেই মূর্তিগুলোকে তারা মনে করত আত্মা। তারা মনে করত ঘুমিয়ে পড়া আর মরে যাওয়া একই ব্যাপার। শুধু ঘুমিয়ে পড়লে আত্মা আবার শরীরের মধ্যে ফিরে আসে তখন মানুষ জেগে ওঠে; কিন্তু মরে গেলে আত্মা চিরকালের জন্যে শরীর ছেড়ে চলে যায় তাই মরে যায় মানুষ। তারা ভাবত মানুষ মরার পরও আত্মা বেঁচে থাকে।

—সেই জন্যেই মিশরের পিরামিডের মধ্যে মরা রাজার সঙ্গে তার ব্যবহার করার জন্যে সব জিনিস দিয়ে দিত, তাই না দাদুভাই? যাতে রাজার আত্মা সে সব ব্যবহার করতে পারে। তাই না?

—একদম ঠিক বলেছিস দাদুভাই? তোর দেখছি খুব বুদ্ধি খুলেছে! শুধু মিশর কেন? আমাদের দেশেও দেখিস না মানুষের শ্রাদ্ধের সময় মরা মানুষটার প্রিয় সব জিনিস দেওয়া হয় ব্রাহ্মণকে? সে-ও তো সেই একই ব্যাপার।

প্রশংসা শুনে বাবাই বেশ খুশি হয়ে ওঠে। সে সত্যিই এখন অনেক কথা খুব সহজেই বুঝতে পারে। একটা ঘটনার সঙ্গে অন্য একটা ঘটনা মিলিয়ে দেখতে পারে সে।

দাদু তখনো বলছে—আসলে প্রকৃতির কোনটা কখন আর কেন হয় সেটা জানা মানুষের কাছে খুবই জরুরি ছিল। তাই তারা পৃথিবী কী করে সৃষ্টি হল, ঝড় কেন হয়, আগুন কেন জ্বলে—সব কিছুর একটা করে যুক্তি তৈরি করতে চাইল তাদের মনের মতন করে। যাতে প্রকৃতিকে তারা বশে আনতে পারে। তারা বিশ্বাস করতে লাগল যে, ঈশ্বরই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মানুষের মঙ্গল করেন। তিনি রেগে গেলে মানুষের ক্ষতি করেন। সেই জন্যই তাঁকে খুশি রাখা দরকার। তাঁকে খুশি রাখতে হলে নানা ধরনের পুজো অর্চনা যাগযজ্ঞ এসব করতে হবে। আর সে সবের নিয়ম কানুন পদ্ধতি নিয়েই তো তৈরি হয়েছে ধর্ম।

একটা দারুণ প্রশ্ন করে বাবাই আবার তার খোলতাই বুদ্ধির পরিচয় দিল। জিজ্ঞাসা করল—প্রকৃতিকে বশে আনার জন্যেই যদি ধর্ম তৈরি হয়ে থাকে তবে এত রকমের ধর্মই বা তৈরি হল কেন, আর এক ধর্মের লোকের সঙ্গে অন্য ধর্মের লোকের রেশারেশিই বা কেন?

প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে যায় দাদু। কিন্তু দাদুর উত্তর দেবার আগেই পিসি দাদুর জন্যে এক কাপ চা আর বাবাইয়ের জন্যে এক গ্লাস দুধ দিয়ে যায়। চা আর দুধের সঙ্গে রয়েছে আবার সিঙ্গাড়া আর রসগোল্লা। দাদুর উত্তর দেওয়া দূরে রইল, এখন দাদু ঝুঁকে পড়েছে খাবারের প্লেটের উপর। অসময়ে এত খাবার দেখে একটুও আশ্চর্য হয় নি বাবাই। বাবার কাছে মার খাওয়ার এইটুকুই লাভ। বাবাইকে বকলে বা মারলেই তিনি নিজেই ভীষণ দুঃখ পান মনে মনে, আর তাড়াতাড়ি খাবার নিয়ে আসেন বাড়ির সকলের জন্যে। বাবাই ভাবে এমন মার খেয়েও আনন্দ!

আদিম কালে মানুষ যখন প্রথম ধর্ম সৃষ্টি করেছিল—দাদু বলতে শুরু করেছে—ধর্মের সাহায্যে তখন তারা শুধু প্রকৃতিকে বশ করে

বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ধর্মের উদ্দেশ্যও ততই পাল্টে যেতে লাগল।

—সে আবার কি? ধর্মের মধ্যে আবার অন্য উদ্দেশ্য মানেটা কি? সিঙ্গাড়া মুখে দিয়ে বাবাই প্রায় বিষম খাবার উপক্রম করে।

—আসলে কি জানিস, দিন যতই যেতে লাগল সমাজের মধ্যে পুরোহিতরা তত বেশি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। ধর্ম কর্ম পুরোহিতরাই পরিচালনা করতেন, আর মানুষ ধর্মকে খুবই ভয় করত তখন, তাই পুরোহিতরা ক্রমে ধর্মকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে লাগলেন। তাঁরা ধর্মের ভিতর দিয়ে প্রচার করে দিলেন যে, আগের জন্মে যারা পাপ করেছে, এই জন্মে তারা গরিব হয়ে জন্মেছে। গরিবদের উচিত পুরোহিত আর বড়লোকদের সেবা করা, কারণ পুরোহিত আর বড়লোকেরা আগের জন্মে খুব পুণ্য করেছিল। ব্যস্, গরিবরা তাই করতে লাগল এবং পুরোহিত আর বড়লোকেরা সুখে-স্বচ্ছন্দে বিলাসের সঙ্গে জীবন কাটাতে লাগল। ধর্ম দিয়ে এইভাবেই ধনীরা গরিবদের উপর অত্যাচার চালাতে লাগল। লাঠির ঘায়ে অথবা চাবুক মেরে গরিবদের সব কেড়ে নিলে গরিবরা অত্যাচারটা বুঝতে পারে, কিন্তু ধর্মের কথা শুনে তারা গলে যায়। ঈশ্বরের নামে বড়লোকের সেবা করে যায়। সেটা যে অত্যাচার তা বুঝতেই পারে না, ধরে নেয় সেটা তাদের কপালের লিখন।

ধর্মের এই অদ্ভুত কলের কথা শুনে বাবাই অনেকক্ষণ বোবা হয়ে থাকে। সে ভাবে ঠাকুরের পায়ের ফুল, বেলপাতা, চন্নমেত্ত নিয়ে এ কী আজব কাণ্ডরে বাবা! তার পর সে ফের জিজ্ঞাসা করে—তা হলে আদিম কালে যে ধর্ম তৈরি হয়েছিল তাই দিয়েই পুরোহিতরা এসব করতে পারত, আবার খ্রিস্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, মুসলিমধর্ম—এসব সৃষ্টি হল কেন?

—সেটাই তো কথা—চায়ে চুমুক দিয়ে দাদু বলল—এই সব ধর্মকে বলে তৈরি করা ধর্ম, ইংরেজিতে বলে অরগানাইজড্ রিলিজিয়ন।

—অরগানাইজড্ রিলিজিয়ন আবার কী?

—যে ধর্ম কোনো একজন মহাপুরুষের চেষ্টায় সৃষ্টি হয় তাকে বলে অরগানাইজড্ রিলিজিয়ন বা তৈরি করা ধর্ম। যেমন, যীশু খ্রিস্ট তৈরি করেছেন খ্রিস্টধর্ম, বুদ্ধদেব তৈরি করেছেন বৌদ্ধধর্ম, মহাবীর সৃষ্টি করেছেন জৈনধর্ম, মহম্মদ তৈরি করেছেন মুসলিম ধর্ম ইত্যাদি, এমনি আছে আরো কত ধর্ম। আদিম যুগের ধর্ম কিন্তু এরকম কোনো একজন মহাপুরুষ ব্যক্তির তৈরি নয়। সেই ধর্মের মধ্যে অন্যের উপর অত্যাচার করবার কোনো উদ্দেশ্যও ছিল না। সমাজের সমস্ত মানুষের চেষ্টায় ঠিক কেমন করে যে সেই ধর্ম করে সৃষ্টি হয়েছিল তা এখনো কেউ সঠিক ভাবে বলতে পারে না।

বাবাই কিছুতেই দাদুকে ঠিক কব্জা করতে পারছে না। যতই সে কাত করতে চায় দাদুকে, দাদু ততই পিছলে পিছলে গিয়ে এক-একটা নতুন নতুন আশ্চর্য কথা বলে। প্রত্যেকবারই অবাক হয়ে যায় বাবাই। কিন্তু আগেই বলেছি এখন সে অনেক বড় হয়েছে আর একটু উঁচু ক্লাসে পড়াশুনোও করছে, তাই এখন আর সে সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। সে আবার বলে—তা দাদু, খ্রিস্ট, বুদ্ধ এরা যদি সব মহাপুরুষই হবেন তবে ধর্ম দিয়ে মানুষের উপর অত্যাচার করা হয় জেনেও তাঁরা আবার নতুন ধর্ম তৈরি করতে গেলেন কেন?

প্রশ্ন শুনে দাদু এবার লাফিয়ে উঠে নাতিকে জড়িয়ে ধরে চিংকার করে ওঠে—সাব্বাস সাব্বাস! এই তো, একেই তো বলে প্রশ্ন! জিতা রহো বেটা! ব্রাভো!!

হিন্দি-ইংরেজি বাংলা বলে বাবাইকে আদর টাদর করে একাক্কার করে দেয় দাদু আনন্দের চোটে। বাবাইয়ের বুকটা ফুলে ওঠে গর্বে। প্রশ্ন করে যে এত আনন্দ হতে পারে তা বাবাই এই প্রথম জানল। ওর মনে পড়ে দাদু একদিন বলেছিল—প্রশ্নই তো আসল কথা! প্রশ্ন আসে বলেই না মানুষ উত্তরের জন্যে এমন হন্যে হয়ে ঘোরে! মানুষকে তো সেই আদিম যুগ থেকে আজকের সভ্যতা পর্যন্ত তাড়াতে তাড়াতে নিয়ে এসেছে ঐ প্রশ্ন। শত শত, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি প্রশ্ন আর প্রশ্ন। সেই রকম প্রশ্ন করার আনন্দ এতদিনে টের পেল বাবাই।

—মহাপুরুষেরা যখন নতুন ধর্ম তৈরি করেন—দাদু বলতে শুরু করে দিয়েছে—তখন কিন্তু তাঁরা মানুষের উপর অত্যাচার করার জন্যে তা করেন নি, অত্যাচার থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই তা করে-ছিলেন। যীশুর দেশে যখন ধর্মের নামে ক্রীতদাস আর গরিবদের উপর দারুণ অত্যাচার করছে ধনীরা আর পুরোহিতরা মিলে, তখন যীশু গরিবদের হয়ে নতুন ধর্ম প্রচার করলে। তার নামই খ্রিস্টধর্ম। তিনি বললেন ধনী-গরিব সবাই সমান। ঈশ্বর সকলকে সমান ভাবে সৃষ্টি করেছেন। ধনীরা আর পুরোহিতরা দেখল এ তো মহা বিপদ। সব মানুষ সমান জেনে ফেললে গরিবরা আর তো বড় লোকের সেবা করবে না। সেই জন্যেই তারা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলল।

—ধনী আর ঐ পুরোহিতরা তো তা হলে মোটেই খুব সুবিধের লোক ছিল না! অবাক হয়ে বলে বাবাই।

—কিন্তু ধনীরা আর রাজারা বুঝল যে, গরিব মানুষের এই খ্রিস্ট ধর্মকে বেশি দিন আটকে রাখা যাবে না, তা ছড়িয়ে পড়বেই। তাই তারা ঐ ধর্মকেই নিজেদের মত করে একটু আধটু বদলে টদলে নিয়ে, গরিবদের সামান্য কিছু সুযোগ সুবিধে দিয়ে, নিজেরাই খ্রিস্টধর্ম মেনে নিয়ে খ্রিস্টান হয়ে গেল। রাজা যখন খ্রিস্টধর্ম মেনে নিল তখন সেটা রাজ-ধর্ম বা রাজার ধর্ম হয়ে গেল। রাজার ধর্ম গ্রহণ করলে সুযোগ সুবিধে বেশি পাওয়া যাবে ভেবে সবাই তখন নির্ভয়ে আনন্দের সঙ্গে সেই ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। রাজারা এবার খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল দিয়েই গরিবদের উপর অত্যাচার করতে লাগল। ধর্মের নামে অত্যাচার, সুতরাং গরিবরা এবারও তা বুঝতে পারল না সময় মত।

—গরিবরা একটু বোকাও আছে, তাই না দাদু?

—বোকা তো তাদের ইচ্ছে করেই করে রাখা হয়, না হলে ধর্মের নামে বড়লোকের কথা সে শুনবে কেন? কি জানিস দাদুভাই? ধনীরা রাজারা পুরোহিতেরা নিজেদের স্বার্থে ঘা লাগে এমন কোনো

সত্যি কথাকেই মেনে নিতে পারে না। মানলেই ভীষণ অসুবিধে। এই দেখ না, গ্যালিলেও, কোপার্নিকাসের মতন বিজ্ঞানীরা যখন প্রমাণ করলেন যে, পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য নয় সূর্যের চারিদিকেই পৃথিবী ঘুরছে, তখন ঐ রাজারা আর পুরোহিতরা বিজ্ঞানীদের বললেন খ্রিস্টধর্মের বিরোধী। তাঁদের উপর অত্যাচারের আর শেষ রইল না। মজাটা দেখ দাদু ভাই, একদিন যে ধনীরা যীশুকেই বিধর্মী বলে মেরে ফেলেছিল, তারাই আবার ঐ খ্রিস্টের নাম দিয়েই গ্যালিলেওর উপর অত্যাচার চালাল। এই হল ধর্মের আজব কল।

আজব কলের ব্যাপার স্যাপার শুনে তাজ্জব হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকে বাবাই। তারপর জিজ্ঞেস করে—আমাদের দেশেও এরকম হয়েছে নাকি কখনো ?

—নিশ্চয়ই হয়েছে—দাদু বলে—এ দেশে ব্রাহ্মণরা যখন ধর্মের নামে নানা রকম অনাচার শুরু করল, যারা ব্রাহ্মণ নয় তাদের ঘৃণা করতে শুরু করল, তখনই তো বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্ম এবং মহাবীর জৈন-ধর্ম সৃষ্টি করলেন। আসলে বুদ্ধদেব আর মহাবীর সমাজের ঘৃণিত মানুষদের হয়ে বেদ আর ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধেই তাঁদের ধর্মমত প্রচার করলেন। দেখিস না, বুদ্ধ আর মহাবীর কেউই কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন ক্ষত্রিয়।

—রাজা অশোক তো বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাই না দাদু ?

—ঠিক বলেছিস। রাজা অশোক যখন এই ধর্ম গ্রহণ করলেন তখন বৌদ্ধধর্ম হয়ে গেল রাজধর্ম। অমনি হাজার হাজার মানুষ সেই ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। রাজা আশাক নিজেই পৃথিবীর দেশে দেশে এই ধর্ম প্রচারের জন্যে লোক পাঠালেন। কিন্তু দেখ বৌদ্ধধর্ম যখন রাজধর্ম হয়ে ওঠেনি, যখন দরিদ্র মানুষের কথা বলা হচ্ছিল ঐ ধর্মের মধ্যে দিয়ে, তখন রাজা অজাতশত্রু কী অত্যাচারটাই করেছেন বৌদ্ধদের উপর। রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিনী' কবিতার 'শ্রীমতী নামে সে দাসীর' কথা মনে নেই তোর দাদুভাই ? তোর তো কবিতাটা মুখস্থ আছে তাই না ?

হাসতে হাসতে বাবাই বলে—এতদিন জানতাম ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, এখন দেখছি মানুষই হচ্ছে সেই বাতাস তাই না দাছু?

—ঠিকই বলেছিস, বাতাসে কি আর কিছু হয়? মানুষ আর মানুষের ছুটো হাতই তো নাড়ায় সব কলকব্জা। তবে ধর্ম জিনিসটা কিন্তু ফেলনা নয় দাছুভাই। মানুষের সমাজে ধর্মের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলই এক সময়। তুই 'পূজারিনী' কবিতার শেষ ক-টা লাইন একটু বল তো দাছুভাই, কানটা একটু জুড়োই—বলে দাছু।

জ্যোৎস্নাভরা বারান্দায় দাছুর কোলে মাথা রেখে, অনেক অনেক দূরে দৃষ্টি মেলে খুব নিচু গলায় মন্ত্রের মতন স্বরে আবৃত্তি করে বাবাই—

মুক্ত কৃপাণে পুররক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি
শুধালো, "কে তুই ওরে দুর্মতি,
মরিবার তরে করিস আরতি?"
মধুর কণ্ঠে শুনিল, "শ্রীমতী,
আমি বুদ্ধের দাসী।"

সে দিন শুভ্র পাষাণ ফলকে
পড়িল রক্তলিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা।

এখন কে বলবে যে একটু আগেই বাবাইয়ের ঘুম পাচ্ছিল? মাথার মধ্যে তার এখন অযুত জিজ্ঞাসার রক্ত ছুটে বেড়াচ্ছে। চোখের থেকে ঘুম যে কোথায় পালিয়েছে কে জানে।

কোদাল দিয়ে কবিতা লেখা

অনেকদিন পরের কথা। বাবাই এখন আরো অনেক বড় হয়ে গেছে। এখন আর সে কথায় কথায় ছুট্টে দাতুর কাছে চলে যায় না। নিজেই সে অনেক কথা ভাবতে আর বুঝতে শিখেছে। ইস্কুলেও যেমন বেশ উঁচু ক্লাসে পড়ে, তেমনি বাড়িতেও তার নিজের একটা বইয়ের শেল্ফ, হয়েছে। বাবাই নিজেই এখন বই পড়ে কত কথা বুঝতে আর শিখতে পারে! দাতুর কাছে গল্প শোনাটা এখনো অবশ্য পুরোপুরি বন্ধ হয়নি।

সেদিন রবিবার। মা ঘরে ঘুমচ্ছেন। বাবা পড়ার ঘরে লেখা-পড়ায় ব্যস্ত। আগের দিন রাতে বাবাইয়ের একটু জ্বর-জ্বর হয়েছিল। আজ তুপুরে তাই কোথাও বেরনো নিষেধ। খাটের নিচের ঘুড়ি আর লাটাইটার দিকে ম্লান মুখে চেয়ে থাকে সে। ঘরের জানলা দিয়ে নীল আকাশে যখন নানান রঙের ঘুড়িগুলো দেখা যাচ্ছিল, তখন সত্যিই বাবাইয়ের মনটা তুঃখে ভারি হয়ে ওঠে। জানলার কাছ থেকে সরে গেল ও। কিন্তু যাবেই বা কোথায়। ওর তো একমাত্র শেষ আশ্রয় সেই দাতুর ঘর। দাতুও আবার ক-দিন ধরে অসুস্থ, তার সেই বুকে ব্যথা আর ব্লাড প্রেসার। অগত্যা ছবি আঁকার কাগজ আর রং-পেনসিলের বাক্স নিয়ে দাতুর ঘরে গিয়েই ঢোকে বাবাই। শীতের তুপুরে চাদর ঢাকা দিয়ে ঘুমচ্ছে দাতু। বাবাই মেঝেতে বসে পড়ে। নীল পেনসিল দিয়ে কাগজে সে নীল আকাশ আঁকল, লাল আর সবুজ রঙে আঁকল তুই রঙা ঘুড়ি। তার থেকে স্বতো নেমে এসেছে নিচে লাটাই পর্যন্ত। ছবির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বাবাইয়ের মনে হল—আরে! আকাশের ওদিকটাতে যেন বুম্বার ঘুড়িটা উড়ছে মনে হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বুম্বার ঘুড়িও এঁকে ফেলল আকাশে, হলুদ রঙের ঘুড়ি সেটা। বাবাই জানে গতকাল বুম্বা হলুদ

রঙের ঘুড়ি কিনেছে একটা। কিন্তু ঘুড়ি কিনলে কি হবে, কাটাকাটিতে বুম্বা পারবে নাকি বাবাইয়ের সঙ্গে! গত পরশুদিন বাবাই সুতোয় মাঞ্জা দিয়েছে সাবু আর কাচের গুঁড়ো দিয়ে। তাই ঘ্যাঁচ্ করে কেটে দিল সে বুম্বার ঘুড়িখানা। ছবিতে দেখা গেল বুম্বার ঘুড়িখানা ভোঁ-কাট্টা হয়ে খানিকটা কাটা সুতো নিয়ে ভাসতে ভাসতে নামছে। এই পর্যন্ত এঁকে নিজের মনেই ফিক্ করে একটু হেসে ফেলে সে বুম্বার মুখের চেহারাখানা ভেবে। ছবিতে বাবাইয়ের লাল সবুজ ঘুড়িখানা উড়তে লাগল। ঘরের কোণে বসে বসেই বুম্বার ঘুড়িখানা কেটে দিতে পেরে খুব আনন্দ পেল বাবাই। কিন্তু ঘুড়ি তো কাটা হয়ে গেছে। এখন সে কী করবে? অন্যমনস্কভাবে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল সে।

অনেকদূরে কোথায় ধোপা কাপড় কাচছে। এখান থেকে তাকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু শব্দটা কানে আসছে। বাবাই কাঠের স্কেলখানা দিয়ে মাটিতে কাপড় কাচার তাল দিতে লাগল। ঠিক কাপড় কাচার তালে তালে সে তাল দিতে পারছিল বলে বাবাইয়ের বেশ মজা হচ্ছিল। হঠাৎ কাচার শব্দ থেমে গেলেও কখনো কখনো বাবাইয়ের তাল পড়ে যাচ্ছিল। নিজেই বোকা বনে গিয়ে একটু হেসে আবার কাপড় কাচা শুরু হলে তাল দিয়ে চলছিল। ধোপাটা যেন বাবাইয়ের সঙ্গে নিজেরই অজান্তে খেলা শুরু করেছে। বাবাই স্কেল দিয়ে মেঝেতে তাল দিয়েই চলেছে খট্ খট্ খট্ খট্।

তখন থেকে কানের কাছে খট্ খট্ করে কবিতা লিখছে কেরে? —সদ্যঘুমভাঙা দাদুর গলা শোনা গেল।

দাদুর ঘুম ভেঙেছে এতেই বাবাই রীতিমত খুশি। কিন্তু দাদুর কথাটা শুনে হেসেই প্রায় গড়াগড়ি যায় সে। খট্ খট্ করে আবার কেউ কবিতা লেখে নাকি? যত বিদ্ঘুটে কথা শোনা যাবে দাদুর কাছে।

কিন্তু দাদু বাবাইয়ের হাসি থামিয়ে দিয়ে বলে—অত হাসির কি হল? আমি ভুলটা বললাম কী? ঐ ভাবেই তো কবিতা হয়।

হাসি থামিয়ে বাবাই বলে—তার মানে ?

—তার মানে বুঝলি না ? কবিতার আসল কথাই তো হল ছন্দ, আর ছন্দ মানেই তো তাল। —দাদু বলে—আর তাল মানে কি ? তাল মানে হল একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর শব্দ করা।

কথাগুলো বলেই দাদু হাতে তালি দিয়ে দিয়ে কবিতা আওড়াতে লাগল—

নদী চলেছে ডাইনে বামে
কভু কোথাও সে নাহি থামে
হেথায় গহন গভীর বন
তীরে নাহি লোক নাহি জন।

বাবাইয়ের কানে ধরা পড়ল কবিতার তালটা, মানে ছন্দটা। বাবাই এবার প্রশ্ন করে—তা হলে ধোপার কি এখন কাপড় কাচতে খুব ফুর্তি হচ্ছে নাকি ? সে কি সেই জন্যে অমন তালে তালে কাপড় কাচছে ?

দাদু একটু হাসল, তারপর বলল—মানুষের বেতালে কি কিছু করার জো আছে ? যত লোক যত পরিশ্রম করছে সবাই কোনো না কোনো একটা তালে করছে। দেখিস না কামারের হাতুড়ি পেটানোর একটা তাল আছে, কাঠুরের গাছ কাটার একটা তাল আছে, মাটি কোপাতে হলে মাটিতে কোদাল পড়ে একটা তালে তালে। তাল ছাড়া মানুষের এক পা চলার উপায় নেই। বেতাল হয় সেখানেই, যেখানে পরিশ্রম কম।

কথাটা একটু ভেবে দেখল বাবাই। সত্যিই তো, এ ব্যাপারটা তো একটা ভাববার মত কথা! সে তাই এবার জিজ্ঞেস করল—কিন্তু দাদু, মানুষ তালে তালে কাজ করে কেন ? বেতালে করলে কি হয় ?

—বেতালে করলে কিছু হয় না দাদু ভাই, কিন্তু মানুষ কোনো কাজ বেতালে করতে পারে না। আসলে কি জানিস, মানুষ যত বেশি পরিশ্রম করে শ্বাস-প্রশ্বাসও তাকে তত তাড়াতাড়ি নিতে হয়।

এখন নিশ্বাস নেওয়া মানে কি? শ্বাস নেওয়া মানে হল ফুসফুস ভর্তি করে বাতাস টেনে নেওয়া। ফুসফুসে বাতাস ভরে নিতে একটা নির্দিষ্ট সময় লাগে, আর সে বাতাস বের করে দিতেও একটা নির্দিষ্ট সময় লাগে। তাই আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসটা চলে একদম মাপা তালে। আবার পরিশ্রম করবার সময় তো শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করে রাখা যায় না। তাই পরিশ্রম করার সময় মানুষ এমনভাবে পরিশ্রম করতে বাধ্য হয় যাতে নিশ্বাস প্রশ্বাসটাও একই সঙ্গে চালিয়ে নেওয়া যায়। এই দেখ না, ধোপা যখন পাটায় বাড়ি মারবার জন্যে কাপড়টা মাথার উপর তুলছে তখন সে বুকের মধ্যে বাতাস নিতে নিতে তুলছে, আর সেই বাতাস ছাড়তে ছাড়তে কাপড়টাকে আছাড় মারছে পাটাতে। ঠিক যখন পাটাতে এসে থপাস করে কাপড়টা পড়ছে তখন সে পুরো নিশ্বাস ছেড়ে দিচ্ছে। এইভাবে তার শ্বাস প্রশ্বাসের তালে তালেই তার হাতের কাপড় ওঠানামা করছে। এর বেতাল করবার কোনো উপায় তো নেই তার। এর জন্যেই সব কাজ হয় তালে তালে।

সত্যিই তো, চোখের উপর এতদিন সে দেখেছে সব কিছুই কিন্তু এই আশ্চর্য ব্যাপারটা তো তার চোখে পড়েনি। সে ভেবে দেখল বর্ষাকালে গ্যাঁ গোঁ গ্যাঁ গোঁ করে ব্যাঙ ডাকে তালে তালে, টগ্ বগ্ টগ্ বগ্ করে ঘোড়া ছোটে তালে তালে, কোকিল কিম্বা ঘুঘু পাখি ডাকে তালে তালে। মানে মানুষ পশু পাখি কেউই বেতালে কিছু করতে পারে না।

দাদু বুকের উপর থেকে চাদরটা একটু নামিয়ে দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বলল—তা হলে তাল, মানে ছন্দ ব্যাপারটা বুঝলি তো দাদু ভাই?

—হ্যাঁ তাতো বুঝলাম কিন্তু দাদু!

বাবাইকে কথা শেষ করতে না দিয়ে দাদু বলল—তা হলে বল দাদুভাই, খট্ খট্ করে কবিতা লেখার কথা শুনে তুই হাসলি কেন?

কোনো জবাব না দিয়ে বাবাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল।

তারপর বলল—কিন্তু দাদু, কবিতা মানে তো শুধু তাল নয়। তার সঙ্গে কথাও থাকতে হবে। তা মানুষ তালে তালে কথা তৈরি করে কবিতা বানাতে শিখল কেমন করে?

—চমৎকার প্রশ্ন করেছিস দাদুভাই—দাদু প্রায় উঠেই বসে আর কি—অনেক কাল আগে মানুষ তো কথাই বলতে পারত না, তার তো ভাষাই ছিল না। তখন তারা কি করত জানিস? পরিশ্রম করতে গিয়ে ঠিক যে সময়টাতে শরীরের সব থেকে বেশি জোর খাটাতে হত সেই সময় নিশ্বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে একটা শব্দ করত। যেমন ধর, বাগানে যখন সর্দার কোদাল কোপায় তখন সে শ্বাস নিতে নিতে কোদালটা মাথার উপর তোলে, তারপর শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোদালটা মাটির দিকে নামাতে থাকে। সব শেষে কোদালটা মাটিতে ঠিক ছোঁবার মুহূর্তে সে হাতে সব থেকে জোর দেয় যাতে কোদাল মাটিতে বসে যায়। আর ঐ জোর দেবার সময়টাতেই 'হুঁ' করে একটা শব্দ করে, শ্বাসও ছেড়ে দেয় সবটা।

—ঠিক বলেছ দাদু, আমি বুঝতে পেরেছি। আর সেই জন্যেই সর্দারজীর 'হুঁ' শব্দটা একটা তালে তালে হয় তাই না? বলে বাবাই।

—পরিশ্রমের সময়ের ঐ আওয়াজটাকেই বলে 'শ্রম-শব্দ', ইংরেজিতে বলে 'লেবার ক্রাই'। ও কি আর বেতালে পড়তে পারে?

—কিন্তু ঐ শব্দটা করেই বা কেন মুখ দিয়ে?

—শব্দটা করলে পরিশ্রম করতে সুবিধে হয়, একটু আরাম হয়, সেই জন্যেই করে। ঐ শ্রম-শব্দ থেকেই আদিকালে কবিতার সৃষ্টি হয়।

বাবাই এবার তড়ি ঘড়ি দাদুর খাটে উঠে বসে। দাদু বলতে থাকে—মানুষ কিন্তু সব থেকে জোর খাটানোর সময়েই শুধু 'হুঁ' করে শব্দ করে না। তার আগেও আর একটা শব্দ করে। রেল ইস্টিশনের ধারে বিরাট শালগাছ কেটে তার বিরাট বিরাট খণ্ডগুলো মজুররা সরাচ্ছিল দেখেছিলি?

—হ্যাঁ দেখেছিলাম, ওগুলো ঠেলতে ঠেলতে লরিতে তুলছিল।

—ঠিক বলেছিস। ওগুলো ঠেলবার সময় মজুররা কিরকম শব্দ করছিল শুনেছিস?

—হ্যাঁ। বলছিল—'আউর থোড়া—হেঁইয়োঁ।'

—ঠিক ঐ 'হেঁইয়োঁ' বলবার সময়তেই সবাই মিলে গুঁড়িটাকে জোরে ধাক্কা মারছিল তাই না? কিন্তু তার আগে ঐ 'আউর থোড়া' কথাটা বলছিল কেন? আসলে একজন যখন 'আউর থোড়া' কথাটা বলছিল অন্যেরা তখন শ্বাসটা বুকের মধ্যে টেনে নিচ্ছিল আর শরীরের সব শক্তিটাকে খুব জোরে ধাক্কা মারবার জন্যে প্রস্তুত করে নিচ্ছিল, তারপর শ্বাস ছাড়তে ছাডতে 'হেঁইয়োঁ' শব্দ করে শেষ ধাক্কাটা মারছিল। তা হলে দেখ দাদুভাই তালটা এখন কিন্তু শুধু 'হেঁইয়োঁ' নয়, তালটা আরো জটিল হয়ে উঠল—'আউর থোড়া. হেঁইয়োঁ', তাই না? আচ্ছা দাদুভাই এবার তুই

'আউর থোড়া হেঁইয়োঁ

মারো জোয়ান হেঁইয়োঁ' এই তালে একটা কবিতা মনে করতে পারিস কিনা দেখ তো।

একটু ভেবে নিয়েই হাসতে হাসতে বাবাই বলে,—পারি দাদু বলছি শোন—

পাগলা ঘোড়া ছুটেছে
বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে।

হো হো করে হেসে ওঠে দাদু। বাবাইয়ের পিঠ চাপড়ে বলে—এই তো ব্যাপারটা প্রায় ধরেই ফেলেছিস দেখছি। আসলে কি জানিস? মানুষ যখন আস্তে আস্তে নিজের ভাষা তৈরি করে ফেলল তখন পরিশ্রম করবার সময় মুখ দিয়ে শুধু অর্থহীন শব্দ না করে, ঐ একই তালে তালে একটু একটু মনের ভাব প্রকাশ করতে লাগল। এটা বেশি করে ঘটতে লাগল সবাই মিলে একসঙ্গে পরিশ্রম করবার ফলে। যেমন দেখ না ঐ 'আউর থোড়া' কিংবা 'মারো জোয়ান' কথাগুলোতে শুধুই আওয়াজ নয়, ওদের এক একটা মানে আছে।

শুধু 'হেঁইয়োঁ।' শব্দগুলো হল শ্রম-শব্দ। এইভাবে মানুষ যখন পরিশ্রমের তালে তালে কথা বলতে শিখে গেল, তখন সে আর শুধু পরিশ্রম করবার সময়েই তালে তালে কথা বলত না। অবসর সময়েও তারা তালে তালে মনের ভাব নানারকম ভাবে প্রকাশ করতে লাগল। আর ছন্দ মেলানো ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করার নামই তো কবিতা।

দাদু আর বাবাই অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। দাদুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেকদিন পরে আজ আবার বাবাইয়ের চোখের উপর থেকে নতুন একটা পর্দা সরে গেল যেন। সে ভাবল মাটি কাটতে গিয়ে সর্দার তাহলে কোদাল দিয়ে কবিতা লেখে। ভেবেই একটু হেসে ফেলে বাবাই।

একটু পরে নিজের মনেই দাদু বলে—মানুষের হাত দুটোই হল সব। হাত দিয়ে মানুষ পরিশ্রম করে। আর ঐ পরিশ্রম করতে গিয়েই আজকের সভ্য মানুষের সমস্ত গৌরবের জিনিসগুলো সৃষ্টি হয়েছে। কবিতা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি হয়েছে গান। গান তো আসলে সুর দেওয়া কবিতা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

—কিন্তু সুর করতে শিখল কি করে মানুষ? আগের বিস্ময় ঝেড়ে ফেলে প্রশ্ন করে বাবাই।

—এ কথার উত্তর কিন্তু এক কথায় হবে না। কারণ নানা বিজ্ঞানীর নানা মত আছে—দাদু বলে—তবে হ্যাঁ, তার মধ্যে একটা মত আমার মনে খুব ধরেছে। তোকে অনেকদিন আগে সেই টোটেমের কথা বলছিলাম মনে আছে?

—হ্যাঁ মনে আছে,—বাবাই বলে—সেই এক একদল মানুষ মনে করত এক এক ধরনের পশু থেকে তাদের জন্ম হয়েছে। সেই পশুকে খুশি করবার জন্যে তার পুজো করত ওরা।

—ঠিক বলেছিস। ঐ টোটেম পুজোর সময় মানুষগুলো যে পশুর পুজো করছে তার গলার স্বর নকল করত। মনে করত তাতে বোধহয় তাদের ঐ টোটেম পশু খুশি হবে। আবার তখনকার

মানুষ শিকার করবার সময় এক এক পশুর গলার স্বর নকল করে শব্দ করত। তাতে ঐ পশুরা তাদের সঙ্গী ভেবে মানুষগুলোর কাছাকাছি চলে আসত, আর মানুষ তাদের শিকার করত।—দাদু বলে—ধর জঙ্গলে গিয়ে শিকারীরা হরিণের ডাক নকল করে ডাকতে লাগল। অমনি হরিণ ভাবল তাদের সঙ্গীরা নিশ্চয়ই ধারে কাছে কোথাও আছে। তাই ওরাও সাড়া দিতে ডেকে উঠল। ব্যাস শিকারীরা বুঝে গেল বনের ঠিক কোন জায়গায় হরিণ আছে। সেখানে গিয়ে তারা হরিণ শিকার করল। কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলেন এইভাবেই বিভিন্ন পশুর ডাক নকল করতে করতে মানুষের গলায় বিভিন্ন রকম সুর তৈরি হয়। পরে সেই সুরে কবিতা বললেই গান তৈরি হয়ে গেল।

বাবাই কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু দাদুর মুখটা কেমন যেন একটু বিকৃত হতে দেখল সে। দাদু বলল—আমার বুকটায় আস্তে আস্তে একটু হাত বুলিয়ে দে তো দাদুভাই, কেমন যেন একটু ব্যথা-ব্যথা করছে।

বাবাই শশব্যস্ত হয়ে দাদুর বুকে হাত বুলোতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। দাদু বেদনাটা যে সামলাতে চেষ্টা করছে সেটা তার মুখের ভাব দেখেই বুঝতে পারছে বাবাই। একটু পরে ব্যথাটা কমে।

থাক আর হাত বুলোতে হবে না—দাদু বলে—নাচ হচ্ছে গানের সঙ্গী। আদিম কালে নাচ আর গান এক সঙ্গেই চলত।

দাদুর বুকের ব্যথাটা এখনো পুরো কমে নি, তাই কথা বলতে বলতেও দাদুর মুখটা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বাবাই বলে—দাদু, এখন আর কথা বল না। আর একদিন শুনব নাচের কথা।

—নারে, এবার একদম সেরে গেছে, আর কোনো অসুবিধে নেই। কি জানিস দাদুভাই, কবে যে আমি সেই আজব সিন্দুকে চলে যাব তার ঠিক নেই। তাই যতক্ষণ বেঁচে আছি বলে যাই। কথার কি আর শেষ আছে?

দাদু একটু হাসল। কিন্তু দাদুর কথা শুনে একবার অজানা আশঙ্কায় হুহু করে উঠল বাবাইয়ের বুকটা।

—অনেক অনেক কাল আগে—দাদু বলছে—মানুষ যখন কথা বলতে পারত না তখন অঙ্গভঙ্গী করে আর নানা রকম ইশারা করে তারা একে অপরের কাছে মনের ভাব প্রকাশ করত। নাচও তো আসলে তাই, মানে মুখে কথা না বলে অঙ্গভঙ্গী করে মনের ভাব প্রকাশ করা। গান যখন মানুষ শিখে গেল, তখন গানের তালে তালে অঙ্গভঙ্গীও করতে লাগল সে। তাতে মনের ভাবও যেমন অনেক বেশি প্রকাশ পেল, একসঙ্গে দলের সমস্ত মানুষ একই রকমভাবে অঙ্গভঙ্গী আর তালে তালে শরীর দোলানোর ফলে আনন্দও পেল বেশি। এইভাবেই সৃষ্টি হল নাচ। কি জানিস দাদু ভাই, নাচ গান কবিতা সবই একদিন মানুষ ঐ বাঁচার তাগিদেই সৃষ্টি করেছিল বুঝলি। কোনো জিনিস শখ করে সৃষ্টি হয় না, বাঁচতে গিয়ে সৃষ্টি করতে বাধ্য হয় মানুষ।

অবাক হয়ে বাবাই দাদুর কথা শুনছিল। কিন্তু আজ যেন দাদুর কথা শুনতে তত ভাল লাগছে না ওর। কারণ সে বেশ বুঝতে পারছে কথা বলতে দাদুর বেশ কষ্ট হচ্ছে। মাঝে মাঝেই মুখটা কেমন করছে দাদু। বাবাই একবার ভাবে সে উঠে যায় এখান থেকে, তা হলে আর দাদু কথা বলতে পারবে না। কিন্তু তাতে দাদুর আরো কষ্ট হবে মনে করে উঠতেও পারে না। সে মনে মনে একটা ফন্দী আঁটল। একটু আগে আঁকা ঘুড়ির ছবিটা এনে দিল। বলল—দেখ দাদু কেমন ছবি এঁকেছি।

ছবি দেখতে তো আর কথা বলতে হয় না—ভাবল বাবাই। কিন্তু ছবি হাতে দিয়েই হল আরো বিপত্তি। দাদুর মুখে যেন কথার খৈ ফুটতে লাগল।

—ছবি বোধ হয় মানুষের সব থেকে প্রাচীন কালের সৃষ্টি বুঝলি। — দাদু বলে—তোর এই ঘুড়ির ছবিখানাও কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে।

নিজের ছবির প্রশংসা শুনে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে নিজের অজান্তেই

যেন বাবাই জিজ্ঞেস করে বসে—কেন গো দাদু, মানুষ ছবি আঁকতে গেল কেন ?

—দাদুভাই, ঠিক তুই যে কারণে এই ঘুড়ির ছবি এঁকেছিস, আদিম যুগের মানুষও সেই কারণেই ছবি আঁকতে শুরু করেছিল। তুই তো দুপুর বেলায় ঘুড়ি নিয়ে রাস্তায় যেতে পারিস নি বলে ঘরে বসেই বুম্বার ঘুড়িটাকে ভো-কাট্টা করে দিয়েছিস তাই না ? দাদু একটু হেসে জিজ্ঞেস করে।

—তুমি ঠিক বলেছ দাদু—একটু লজ্জা নিয়ে বাবাই ছবিতে আঙুল দেখিয়ে বলে—বুম্বা ঠিক এইরকম একটা ঘুড়ি কিনেছে। কিন্তু ওর ভাল মাঞ্জা নেই সুতোয়। তাই আমি দিলাম ভোঁ-কাট্টা করে।

—তা হলে দেখ দাদুভাই, তুই সত্যি সত্যি ঘুড়ি ওড়াতে পারিস নি বলেই ঘরে বসে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েছিস তাই না ? আসলে তোর ইচ্ছে ছিল সত্যিকারের ঘুড়ি নিয়ে বেরিয়ে বুম্বার সাথে প্যাঁচ খেলে ওর ঘুড়িটাকে ভোঁ-কাট্টা করে দেওয়া, এই তো ?

দাদুর কথার উত্তর না দিয়ে হাসিমুখে চুপ করে থাকে বাবাই। ধরা পড়ে গিয়ে ওর যেন একটু লজ্জা লজ্জা করছে।

দাদু বলে—আদিম যুগে ঠিক এই কারণেই মানুষ ছবি আঁকা শিখেছিল। তখন ছিল মানুষের খাবারের খুব অভাব। শিকার করতে না পারলে আবার খাবারও জুটবে না। তারা তাই পাহাড়ের গুহার মধ্যে ছবি আঁকত। কোনো ছবিতে দেখা যায় একটা বড় বাইসনকে বর্শা দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলা হয়েছে, কোনো ছবিতে আবার দেখা যায় সবাই মিলে একটা পশুকে ঘিরে ফেলেছে আর সেটাকে মারার চেষ্টা করছে সবাই মিলে।

—এমন ছবি আছে নাকি কোথাও ? বিস্মিত বাবাই জিজ্ঞেস করে।

—নিশ্চয়ই—দাদু বলে—স্পেন দেশের আলতামিরা গুহায় আদিম মানুষের আঁকা এমন সব ছবি আবিষ্কার করা গেছে।

পরে অবশ্য পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার বিভিন্ন গুহাতেও এমন সব অনেক ছবি পাওয়া গেছে।

আশ্চর্য হয়ে বাবাই ভাবে কত কাণ্ডই না করেছে মানুষ বাঁচার জন্যে।

দাদু বলে—সত্যিকারের শিকার পাওয়া তো তখন ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তাই ছবি এঁকে তারা তোর ঘুড়ির ছবির মতন দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাত। তাদের আবার বিশ্বাস ছিল অমন সব ছবি আঁকলে সত্যিই সব ঐ রকম শিকার পাওয়া যাবে। তারা আরো বেশি করে ঐ সব ছবি আঁকত।

বিস্মিত বাবাইকে চুপচাপ দেখে দাদু আবার বলে—মানুষ এই ভাবেই প্রথম ছবি আঁকতে চেষ্টা করে। তারপর ছবি আঁকা অভ্যেস হয়ে গেলে এমনিই মানুষ আনন্দের জন্যে আর গভীর গভীর কথা এবং ভাব প্রকাশ করবার জন্যে সুন্দর সুন্দর সব ছবি আঁকতে লাগল। তবেই না সৃষ্টি হয়েছে মোনালিসা, ম্যাডোনা, শেষ ভোজ বা শান্তি পারাবতের মতন ছবি। সবই মানুষের হাজার হাজার বছরের পরিশ্রমের ফল বুঝলি দাদু ভাই।

বাবাই ভাবতে ভাবতে কোন অতল গভীরে ডুবে যায়। সে ভাবে একদিন জড়বস্তু থেকে জীবের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই জীবকণা থেকেই কোটি বছর ধরে সৃষ্টি হল মানুষ, আর মানুষের জন্মমুহূর্ত থেকে কত কীর্তিই না সে করে চলেছে। এই চিন্তার যেন আর আদি অন্ত নেই। সত্যি, সব কেমন করে হল!

হঠাৎ একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনে বাবাইয়ের চমক ভাঙে। সে দেখে দাদু মুখ বিকৃত করে কেমন যেন করছে অসহ্য যন্ত্রণায়। চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে দাদুর। দাদু নিশ্বাস নিতে পারছে না। সেই মুহূর্তে কি করবে কিছুই বুঝতে না পেরে চিৎকার করে ওঠে বাবাই। মা, বাবা, পিসি সবাই ছুটে আসেন। বাবা বললেন—স্ট্রোক্। সঙ্গে সঙ্গে হুলুস্থুল কাণ্ড শুরু হয় বাড়িতে। পাড়ার লোক জড়ো হয়ে যায়। ডাক্তার, ইনজেক্শন, অক্সিজেন—

সিলিণ্ডার সব কিছু মিলে সারা বাড়িতে কেমন যেন বিশৃঙ্খল অবস্থা। চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন পিসি। পাশের বাড়ির কে যেন তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এল একখানা। দাত্বকে হাসপাতালে নিয়ে গেল সবাই মিলে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বোকা হাবার মত দাঁড়িয়ে থাকে বাবাই। বড়দের এইসব উদ্বেগপূর্ণ কর্মকাণ্ডের মধ্যে তার কিছু করবারও নেই আবার প্রাণ খুলে হাসতে বা কাঁদতেও ভুলে গেছে সে। শুধু বুঝল ওর দাত্ব—ওর বুড়ো বন্ধুটা এখন আর ওর কাছে নেই, দাত্ব এখন হাসপাতালে।

দাত্বর শুভেচ্ছা

দাত্ব সেই যে হাসপাতালে গেছিল, আর ফেরে নি। দাত্ব মারা যাবার পরও বহুদিন কেটে গেছে। মাস কয়েক আগে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ হয়েছে তার। বাড়িতে সব কিছু থেকেও কী যেন একটা নেই বলে মনে হয় এখন। বাবাই মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে এবার। কিন্তু তার মধ্যে সেই আগেকার ফুর্তিটা কেমন যেন নিভে আছে। কারো সঙ্গেই বিশেষ কথা বলে না। ওর যেন মনে হয় ওর কথা কেউ তেমন করে বোঝে না, যেমন বুঝত দাত্ব। মাঝে মাঝেই ওকে পড়ার ঘরে রাখা দাত্বর বিরাট ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। বোধ হয়, মনে মনে কথা বলার চেষ্টা করে নির্বাক ছবিটার সঙ্গে। সে নিশ্চয়ই মনের কানে শুনতেও পায় দাত্বর সেই চির পরিচিত হাসির শব্দ ফ্যাক ফ্যাক ফ্যাক। ওর চোখের সামনে বোধহয় ভেসে ওঠে দাত্বর বাঁধানো দাঁতের সেই চির প্রসন্ন মুখখানা।

অনেকদিন পরে এই সেদিন হঠাৎ বাবা এলেন হাতে মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে। মুখে তাঁর খুশির ঢেউ। বাবাইয়ের মা বুঝলেন এমন কিছু একটা ঘটেছে যাতে কিছুক্ষণের জন্যেও অন্তত বাড়ির থমথমে ভাবটা কেটে গেছে। আসলে বাবাই সব সময় বিমর্ষ থাকে বলেই

ওর বাবা-মাও তেমন খুশি থাকতে পারেন না। বাবাইকে নিয়ে তাঁদের দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে চেপে বসে থাকে। তাঁরা এখন আরো বেশি করে বুঝতে পারেন নিষ্কর্মা বৃদ্ধটি এই পরিবারের কতখানি ছিলেন।

বাবাইয়ের বাবার হাতে মিষ্টি আর মনে খুশি দেখে বাবাইয়ের মা বিস্ময় নিয়ে তাকালেন। বাবা তখন বিস্তৃতভাবে ঘটনাটি বললেন কলেজ থেকে ফেরার সময় বাবাইদের ইসকুলের হেড্‌মাস্টার মশাই-য়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, তিনিই ব্যাপারটা বাবাইয়ের বাবাকে বললেন। ঘটনাটা এবার বাবাইয়ের মাকে বললেন বাবা।

বাবাইদের ইসকুলে ইনসপেক্টর এসেছেন। ইসকুলের সবাই একেবারে তটস্থ হয়ে আছে। শোনা গেছে এই ইনসপেক্টর মশাই নাকি খুবই কড়া মেজাজের। পান থেকে চুণ খসবার জোটি নেই।

হেডমাস্টার মশাইকে সঙ্গে নিয়ে বেশ কয়েকটি ক্লাসে পরিদর্শনের পর প্রবীন ইনসপেক্টর এবার বাবাইদের ক্লাসে ঢুকলেন। সারা ক্লাস নিস্তব্ধ। আলপিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। ইনসপেক্টর মশাই সারা ক্লাসের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এই ক্লাসের ফাস্‌ট বয় কে?

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে উঠল টিঙ্কু। তার বুকে তখন যেন বিসর্জনের ঢাক বাজছে।

—বল তো ভগবানের তৈরি এই দুনিয়ায় ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কোনটি? ইনসপেক্টরের প্রশ্ন।

—মানুষই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব স্যার। টিঙ্কু আমতা আমতা করে উত্তর দেয়।

—ভেরি গুড্। সিট ডাউন।

কথাটা শুনেই তৃতীয় বেঞ্চিতে বসে থাকা বাবাইয়ের কেন জানিনা শরীরটা জ্বলে গেল। নিজের অজান্তেই ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত সে লাফিয়ে উঠল। ইনসপেক্টরের মুখের উপরে তীরের মত ছুঁড়ে দিল অতি সাংঘাতিক এক প্রশ্ন—স্যার, আপনি বললেন

ছুনিয়াটা ঈশ্বরের সৃষ্টি। কিন্তু ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করেছেন স্যার? বাবাইয়ের বুকের ভিতর দাছুর উজ্জ্বল উপস্থিতি।

ইনসপেক্টর আশা করেন নি এই ধরনের কোনো বেয়াড়া প্রশ্ন দশম শ্রেণীর একটি তৃতীয় বেঞ্চিতে বসা ছাত্রের কাছ থেকে আসতে পারে। তিনি একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন। হেডমাস্টার মশাই ঘামতে শুরু করেছেন। তিনি বিষম খাবার মত ছুবার খুক খুক করে কেশে মুখটা রুমাল দিয়ে মুছলেন। ইনসপেক্টর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলেন—দেখ বাবা, ঈশ্বর তো ঈশ্বরই। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করে নি। তিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি স্বয়ম্ভু।

কথা কটা বলেই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ইনসপেক্টর সাহেব। কিন্তু দরজার কাছে যাবার আগেই বাবাই আবার প্রশ্ন করে বসেছে—তা হলে বস্তুজগৎ তো স্যার বস্তু জগৎই। সে-ও যদি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে স্বয়ম্ভূ হয় তাতে ক্ষতি কি স্যার?

এবার ইনসপেক্টর একটু যেন উষ্ণ হয়ে ওঠেন। হেডমাস্টার মশাইও কিছু বলতে পারেন না, কিন্তু ক্রোধে তাঁর চোখ লাল হয়ে উঠেছে। ইনসপেক্টর বলেন—তুমি তো খুব পাকা ছেলে হে! বল তো দেখি জ্যামিতির সরলরেখা আর বক্ররেখা সম্পর্কে কী জান?

প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘুরছে দেখে সকলেই যেন একটু স্বস্তি পেল। কিন্তু বাবাই ততক্ষণে সরলরেখা আর বক্ররেখার সৃষ্টিতত্ত্ব বলতে শুরু করেছে। সরলরেখা—বক্ররেখার নাড়ীনক্ষত্র উদ্ধার করবার দায় যেন বাবাইয়ের কাঁধে চাপানো হয়েছে। সে বলছে—স্যার, আদিম সভ্যতাগুলো সবই গড়ে উঠেছে কোনো না কোনো নদীর তীরে। নীলনদ, সিন্ধুনদ, টাইগ্রীস, ইউফ্রেটিস ইত্যাদি নদীর তীরে আজও নানা সভ্যতার ধ্বংসচিহ্ন দেখা যাবে। নদীর তীরে সভ্যতা গড়ে ওঠার পিছনে একটি প্রধান কারণ হল এই যে, নদীর প্লাবনে ধুয়ে যাওয়া তীরভূমিতে পলিমাটি পড়ার ফলে সেখানে ভাল ফসল হত। নদীর জল তীরভূমিতে কতদূর পর্যন্ত এল সেই স্রোতোরেখা বরাবর আদিম

মানুষেরা চিহ্ন করে রাখত। কারণ ওখানেই পলি পড়েছে, ওর বাইরে পড়ে নি। ঐ চিহ্নের বাইরে ফসল বুনলে তাই ভাল ফসল হবে না। স্রোতোরেখা বরাবর এই দাগ টেনে চিহ্ন দেওয়া থেকেই আদিম কালে সরলরেখা ও বক্ররেখার ধারণা আসে। অনেক পরবর্তী কালে···

বাবাই আরো যেন কী সব বলতে যাচ্ছিল। হেডমাস্টারমশাই কিংবা ইনসপেক্টর সাহেব কারোর মনেই এখন আর রাগ বা উষ্মা নেই। তাঁরা বাবাইয়ের কথা শুনে আর আত্মবিশ্বাস দেখে কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছেন। বাবাইকে থামিয়ে ইনসপেক্টর মশাই গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—তোমাদের এ. পি. জি. পি.র অঙ্ক করানো হয় ?

ইনসপেক্টর আর হেডমাস্টার মশাই মুগ্ধ হয়ে গেছেন বুঝতে পেরে বাবাইয়ের সাহস আরো দ্বিগুণিত হয়। সে বলে—হ্যাঁ স্যার, ঐ অঙ্ক আমরা করি। এই অঙ্কও মানুষের প্রয়োজনেই একদিন সৃষ্টি হয়েছিল স্যার।

—কি রকম, কি রকম ? ইনসপেক্টর মশাইয়ের আগ্রহ। এখন হেডমাস্টার মশাইয়ের মুখটাও গর্বিত দেখাচ্ছে। বাবাইদের ক্লাসের ছেলেদের ছোট ছোট বুকগুলোও যেন ফুলে ফুলে উঠছে।

—স্যার, প্রাচীনকালে যাগ যজ্ঞ করাটা মুনিঋষিদের এবং মানুষের সমাজে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। যজ্ঞ করবার জন্যে নানা আকারের আর নানা মাপের বেদি তৈরি করবার প্রয়োজন হত। বাবাই বলে—প্রথমে অনেকগুলি পাথর সাজানো হত, তার পর অল্প-সংখ্যক পাথর, তারপর আরো অল্প সংখ্যক পাথর সাজাতে সাজাতে চূড়ার মত এক একটা সুন্দর বেদি তৈরি হত। বেদিগুলোর ছিল বিভিন্ন নাম। কোনোটা শ্যেনপুচ্ছ বেদি, কোনোটা বাজসনীয় বেদি ইত্যাদি। এক এক ধরনের বেদির পাথর সাজাবার এক এক রকম হিসাব। এই হিসাব শিখতে গিয়েই এ. পি., জি. পি সৃষ্টি হয়েছে স্যার!

পরম মুগ্ধ ইনসপেক্টর আর গৌরবে উন্নতশির হেডমাস্টার মশাই আর দাঁড়ান নি। তাঁরা এসে হেডমাস্টার মশাইয়ের অফিসে বসলেন। অনেকক্ষণ হেডমাস্টার মশাই কোনো কথা বললেন না। বেশ

কিছুক্ষণ পরে এক গ্লাস জল চেয়ে খেলেন। তারপর বললেন—ছেলেটিকে একটু ডেকে পাঠাতে পারেন ?

হেডমাস্টার মশাই বাবাইকে অফিস ঘরে ডেকে পাঠালেন। ইনসপেক্টর মশাই কোনো কথা না বলে দুই হাত দিয়ে বাবাইয়ের রোগা শরীরটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। চোখে তাঁর আনন্দের অশ্রু। বাবাই হেডমাস্টার মশাই আর ইনসপেক্টর মশাইকে প্রণাম করল।

ইনসপেক্টর সাহেব যাবার সময় হেডমাস্টার মশাইকে নিভৃতে বলে গেছেন—ছেলেটার উপর যত্ন নেবেন। ও সাধারণ ছেলে নয়। দেশে তো এমন ছেলেরই প্রয়োজন। বই মুখস্থ করে ফাস্ট হয় অনেক ছেলে। কিন্তু জীবন আর জগৎটাকে অমনভাবে দেখতে শেখে কয়জন ? আমাকে একেবারে নাকাল করে ছেড়েছে মশাই।

অন্যান্য শিক্ষক আর হেডমাস্টার মশাই গর্বে বুক ফুলিয়ে মুখে বিনয়ের হাসি মাখিয়ে রেখেছেন ইনসপেক্টর মশাইয়ের কথা শুনতে শুনতে। যাঁরা বাবাইয়ের দাদুকে চিনতেন আর নাতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটাকে জানতেন তাঁরা নিশ্চয়ই মনে মনে নমস্কার জানালেন সেই জ্ঞানবৃদ্ধ প্রয়াত মানুষটির প্রতি।

বাবাইয়ের বাবার মুখে ঘটনাটা শুনতে শুনতে মার মনের ভিতর যে আনন্দের শিহরণ জাগছিল তা লুকিয়ে রাখতে না পেরে তিনি দাদুর ফটোর কাছে ধূপ জ্বালবার ছল করে মিনিট দুয়েকের জন্যে চোখের আড়াল হলেন। আসলে তিনিও মনে মনে জানেন বাবাইয়ের মনোজগতের এই আলোর ঝর্ণা, সেই বৃদ্ধ মানুষটির স্নেহময় আর জ্ঞানময় বুকের উৎস থেকেই নির্ধারিত হচ্ছে।

বারান্দায় রেলিঙের ধারটায় দাঁড়িয়ে অস্তায়মান সূর্য দেখতে দেখতে বাবাইও বাবার কথাগুলি শুনছিল না শোনার ভান করে। কোনো কথা বলছিল না। মা ধূপ জ্বেলে এসে যখন বাবার আনা খাবারগুলো প্লেটে ভাগ করছিলেন তখন বাবাইয়ের বাবা বলেন—বাবাইকে ডাক্তারিই পড়াব ভাবছি, তুমি কী বল ?

মা কিছু উত্তর দেবার আগেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। বাবাই হঠাৎ তীব্র চিৎকার করে উঠল—না না না আমি পড়ব না—পড়ব না। তারপরই উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালিয়ে গেল।

বাবা ডাকলেন—শোন বাবাই, কি হয়েছে?

মা বললেন—কোথায় যাচ্ছ বাবাই, শোন।

ওঁরা দুজনেই বাবাইয়ের পিছন পিছন ছুটে গেলেন। বাবাই দাদুর বিরাট ফটোখানার কাছে মাথা ঠেকিয়ে হাহাকার করে কাঁদছে। সদ্য জ্বালা ধূপের ধোঁয়া সুগন্ধ দিয়ে সারা ঘর ভরে দিয়েছে। বাবাই কাঁদছে আর মৃদু কণ্ঠে বলছে—আমি ডাক্তারি পড়ব না দাদু, আমি ইঞ্জিনীয়ার হব না। আমি তোমার মত মাস্টার-মশাই হব দাদু—মাস্টারমশাই হব। মা-বাবাকে তুমি বারণ কর—বারণ কর।

মা আর বাবা পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন বাবাই তা জানে না। তাঁরাও কোনো কথা বলতে পারছেন না। দু জনে শুধু দু জনের দিকে তাকিয়ে আছেন, দু জনেরই চোখে জল। এমন দৃশ্য স্বর্গেও সচরাচর দেখা যায় কিনা স্বর্গবিশ্বাসীরা জানেন। নিঃশব্দে মা আর বাবা দু জনেই হাত রাখলেন ছেলের মাথায়। বললেন—তোর যা ইচ্ছা তাই-ই হবি বাবা। শিক্ষক হওয়া তো খুব বড় কাজ।

কথা শুনে চোখে জল আর মুখে হাসি নিয়ে বাবাই মুখ লুকাল মায়ের বুকে। বাবার ঠোঁটে মৃদু হাসি, কিন্তু আবেগে মার ঠোঁট দুটো তখনো একটু একটু কেঁপে কেঁপে উঠছে। এতদিনে সত্যিই যেন বাড়ির মন মরা ভাবটা কেটে গেল।

বাবাই যেন মায়ের বুকে মুখ রেখে শুনতে পাচ্ছে ফটোর কাচের মধ্যে থেকে দাদুর ফোকলা মুখের চির পরিচিত হাসির শব্দ। হাসতে হাসতে বাবাইকে শুভেচ্ছা আর আশিস জানাচ্ছে বোধ হয় দাদু—ফ্যাক ফ্যাক ফ্যাক।